জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সম্প্রসারণ কেন্দ্রের অধীনে
২০২০- ২০২১ অর্থ বছরের গবেষণা প্রকল্পের জন্য প্রণীত অভিসন্দর্ভ

শিরোনাম

ময়মনসিংহ গীতিকা'র মহুয়া নাট্য প্রযোজনায় নারীর প্রতিরূপায়ণ

প্রকল্প পরিচালক

মো. মেহেদী তানজির
সহকারী অধ্যাপক
নাট্যকলা ও পরিবেশনা বিদ্যা বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ- ২২২৪

কে শোষিত হলো আর কেইবা শোষণ করে চলেছে! কোথাও না কোথাও শোষকও আটকে পড়ে যায়। শোষিতকে শোষন না করলে তারও মুক্তি নেই। সে যে হারাবে তার অস্তিত্ব। শোষিতও সামাজিকীকরণের কারণে এমন 'হেজিমোনাইজড' হয়ে পড়ে যে তার জীবনাচরণে এই শোষণ না হতে পারাটা অবাস্তব বলে বিশ্বাস হতে শুরু করে। প্রকারন্তরে নিপীড়নের খেলায় আহত হয় দু'দলই।

এই ক্ষমতা কাঠামো যাপিত জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি কিংবা একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিটি ক্ষেত্রেই শোষক অথবা শোষিত যেকোনো একটি শ্রেণিতে নিজেকে দাঁড় করানো যাবেই। দেশ, কাল, অবস্থান, রূপ, রং, ধর্ম, চেতন, অচেতন কিংবা অবচেতন প্রতিটি স্তরেই আমরা হয় শোষক নয় শোষিত। বলা যায়, ক্ষেত্রে বিশেষে আমরাই শোষক, আমরাই শোষিত।

সামাজিক যাপনে এমনই গুরুত্বপূর্ণ স্তরে নারী ও পুরুষের অবস্থান। নারী কিংবা পুরুষ যেকোনো একটির অস্তিত্ব বিলীন হলে অপরটি নিশ্চিহ্ন হওয়া অবধারিত। নির্ভরশীল এই স্তরে তবে একে অন্যের খেয়াল রাখার কথা। একে অন্যের অস্বস্তি দূর করতে সম্পূর্ণ সামর্থ্যের বিনিয়োগ করার কথা! জাতিগত পরিচয় 'মানুষ' ভাবলে এমন পাশাপাশি দাঁড়াবার নজিরও দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীতে অন্য সকল সংকটের সাথে লড়াই করে মানুষের অভিযোজন ইতিহাস পাশে দাঁড়াবার প্রমাণ বহন করে চলছে। তাহলে এই বইয়ের আলোচনাই বা কেনো?

মোটামুটি নিশ্চিত পাঠক ইতিমধ্যে হাজারটা কারণ মনের উঠানে জড়ো করতে শুরু করেছেন। জাতিগত পরিচয়ে আমরা মানুষ হলেও এর ভেতরে আছে অসংখ্য দল-উপদল। অপেক্ষাকৃত কম নমনীয় শ্রেণীকে অবনমিত করা এই দল-উপদলের মনস্তত্ত্বের গভীর স্তরে সক্রিয়। অন্য প্রাণীদের সাথে লড়াইয়ে যেমনটা ঘটে। আধিপত্য বিস্তারে মানুষ যেমন কাউকে ছাড় দিতে নারাজ ঠিক তেমনি নিজেদের ভেতরেও এই আধিপত্য বিস্তারের লড়াই বিদ্যমান। আবার সর্বক্ষণ একটি দল অন্য দলের উপর আধিপত্য বজায় রাখতে পারে এমনটা ধারণা করাও যথাযথ নয়। তবে লড়াইটা চলমান।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষরা লাগাম ধরে রাখতে সক্ষম হয়। তবে এই লাগাম কখনো কখনো পুরুষের হতে এগিয়ে দেয় স্বয়ং নারী। নারী/ পুরুষ তার রূপ বদলায়। পুরুষের স্থলাভিষিক্ত হয়ে আটকে দাঁড়ায় নারী মুক্তির পথ। একই ঘটনা পুরুষের ব্যাপারেও ঘটে। কোনো কোনো পুরুষ

অবদমনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাথি হতে চায় নারীর। জীবনের নানান চর্চায় তা লক্ষণীয়।

নাটক, সাহিত্য, কিংবা লড়াই প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের এই দ্বন্দ প্রকাশিত। ক্ষেত্রবিশেষে লুকায়িত। ১৬৫০ সাল নাগাদ দ্বিজ কানাই রচিত মহুয়া পালা এর প্রমাণ বহন করে। নারি-পুরুষের লড়াইটা এখানেও বিদ্যমান। একজন পুরুষ দলপ্রধানের দলে, একজন পুরুষ নাট্যকারের রচনায়, বর্তমানে পুরুষ নির্দেশকের নির্দেশিত প্রযোজনা নারীর কথা বলছে। সুতরাং খুঁজে দেখতে দোষ কী, কে কাকে শোষণ করছে? অথবা পুরুষ নির্দেশক কী উপায়ে অভিনেত্রী-অভিনেতাকে ব্যবহারে প্রযোজনায় নারীর বয়ান করেছে যেখানে নারীর কথাই কি প্রকাশিত হচ্ছে? না কি নারীর কণ্ঠে পুরুষ বন্দনাই শেষ পরিণতি? এমন অনেক প্রশ্ন থেকেই এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর পর্যায়ক্রমে সন্নিবেশিত হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রের প্রকল্প সম্পন্ন করতে গিয়ে এমন চিন্তা ডাল পালা মেলে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ প্রদান করা তাই অপরিহার্য্য। তাছাড়া নাট্যকলা ও পরিবেশনা বিদ্যা বিভাগের সকলকেই নিবিড়ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাঁদের সান্নিধ্যেই আমার কাজের শক্তি আহরিত হয়।

বিলকিস ও তারেক, উৎসাহের অন্তরালে কার্যকর জ্বালানি। অক্লান্ত পরিশ্রমী, আত্মনিষ্ঠ এবং সঠিক সুযোগ সৃষ্টির প্রস্তুতিতে যথাযথ সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মনিয়োগ করা এই দুই সাবেক শিক্ষার্থী বন্ধুর মতো এগিয়ে নিয়ে গেছেন বলেই বইটি রূপ লাভে সক্ষম হয়েছে। তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

অলসতা কিংবা অপ্রাসঙ্গিক চিন্তার জ্বাল ছিঁড়ে সক্রিয় করে তোলার জন্য প্রয়োজন অনুপ্রেরণার। অনুপ্রেরণা আসতে পারে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে, আসতে পারে অভিজ্ঞতার ঝুলি বিকাশের উৎসাহ থেকে। আসতে পারে কারো রূপ ধরে। এই বইয়ের পেছনের অনুপ্রেরণার নাম লাবনী। পিতৃতন্ত্র কিংবা মাতৃতন্ত্র সবসময় জেন্ডার দিয়ে বিচার্জ নয় তার কার্যকর উদাহরণ লাবনী। অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাই তোমায়।

বেঁচে থাকার নতুন উৎসাহ 'প্রাচ্য', কণ্যা আমার। অম্লান হাঁসি লেগে থাকুক তোর ঠোঁটে। ছোট্ট শিশুকে নারী অথবা পুরুষ নয় মানুষ করে গড়ে তুলতে তাইতো বই খুলে বসা, পর্যায়ক্রমে কলম হাতে নেওয়া।

বইটির জন্য তথ্য সংগ্রহ জরুরী ছিলো। তথ্য প্রাপ্তির জন্য থিয়েটারের চর্চা খুঁজে দেখা অপরিহার্য্য। ময়মনসিংহের যে সকল নাট্যদল এর খোরাক যুগিয়েছেন অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের প্রতি।

পরিশেষে ধন্যবাদ অর্জন করেছে..... প্রকাশনী। একটি পাণ্ডুলিপি মঞ্চে না আসলে যেমন তা প্রযোজনা হয়ে ওঠে না ঠিক তেমনি একটি লেখনীও পাঠকের সামনে প্রকাশিত না হলে বই হয়ে ওঠে না। পাঠক মনে মিথস্ক্রিয়া উৎপাদন করতে পাশে দাঁড়িয়ে ..... প্রকাশনী আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অকুণ্ঠচিত্তে।

মো মেহেদী তানজির
০১-০৭-২০২২
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ- ২২২৪

সূচীপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্টা
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা	**৭- ২৪**
দ্বিতীয় অধ্যায়	ময়মনসিংহ গীতিকার অভিজ্ঞান : মহুয়া	**২৫- ৩৫**
তৃতীয় অধ্যায়	পাণ্ডুলিপিতে নারীতত্ত্ব অনুসন্ধান	**৩৬- ৫০**
চতূর্থ অধ্যায়	সমকালীন প্রযোজনায় নারীর প্রতিরূপায়ণ	**৫১- ৭৪**
পঞ্চম অধ্যায়	পাণ্ডুলিপি থেকে প্রযোজনা	**৭৫- ৮২**
ষষ্ঠ অধ্যায়	উপসংহার	**৮৩- ৮৭**
পরিশিষ্ট		**৮৮- ৮৯**

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বিনোদন নাটকের একমাত্র লক্ষ্য নয়। নাটক সমাজ- সংস্কৃতি এবং মানবিক উন্নয়নের স্বরূপ প্রকাশ করে। সমাজে অন্যান্য অনুষঙ্গের মতো নাটক তার নিজ ক্ষেত্র হতে সমাজকে ব্যাখ্যা এবং চলার পথ সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করে। সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী- পুরুষ পাশাপাশি সক্রিয় হতে হয়, কারণ উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক এবং যৌথ প্রক্রিয়া। উন্নয়নের সঙ্গে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট রয়েছে। "বাংলাদেশে স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক ২০২০ এর ফলাফল অনুযায়ী এদেশে ৮কোটি ৪২ লক্ষ পুরুষ এবং ৮ কোটি ৪০ লক্ষ নারী রয়েছে অর্থাৎ দেশের পুরুষ ও নারীর অনুপাত প্রায় সমান।" (সময় নিউজি টিভি, ২০২১) নারীকেন্দ্রিক যেসব চিন্তা সমাজে এবং সাহিত্যে বিদ্যমান তা সামগ্রিক জাতির উপর প্রভাব ফেলে, একই সাথে সমাজের দর্শন ও সাহিত্য এবং নাটকে প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় থাকে। বিদ্যমান জ্ঞান যেমন নারী সম্পর্কে প্রতিনিয়ত চিন্তার খোরাক যোগায় তেমনি নারী নিজেও তার কর্মের মাধ্যমে নিজের অবস্থানের ছাপ রেখে যায়। দেশের আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ সকল চিন্তার একটা সুস্পষ্ট প্রভাব আছে যা সমাজে নারীর অবস্থান কোন পর্যায়ে রয়েছে নাটক প্রযোজনার প্রতিরূপায়ণে তা প্রতীয়মান হয়।

থিয়েটার বা নাট্য বলতে সমাজ শুধুমাত্র বিনোদনের একটি উপায় বা মাধ্যম বলে মনে করলেও থিয়েটার বা নাট্যের ভূমিকা অন্যান্য ক্ষেত্রেও রয়েছে। শুধু নাট্য নয় পারফরম্যান্স বা অভিকরণ সমাজে ৭টি উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।

> Putting together ideas drawn from various sources, I find seven functions of performance:
> 1 to entertain
> 2 to create beauty
> 3 to mark or change identity
> 4 to make or foster community
> 5 to heal 6 to teach or persuade
> 7 to deal with the sacred and the demonic…

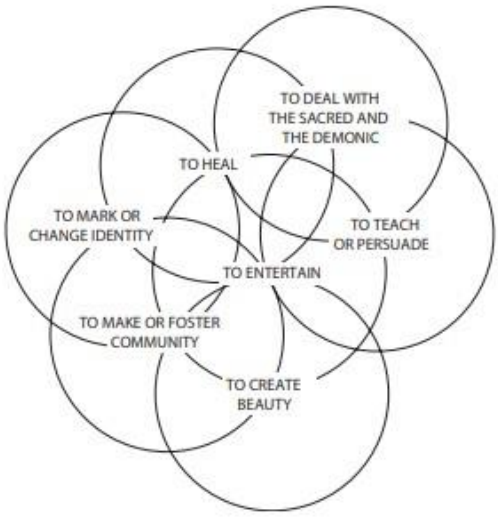

> the seven interlocking spheres of performance. Drawing by Richard Schechner. (Schechner, 2020)

শেখনার দেখিয়েছেন অভিকরণ যে উদ্দেশ্যে হোক না কেনো তার সাথে নিম্নক্ত উদ্দেশ্যসমূহও যুক্ত। পর্যায়ক্রমে এগুলো হলো- ১. বিনোদনের জন্য, ২. সৌন্দর্য তৈরি করতে, ৩. পরিচয় চিহ্নিত করা বা পরিবর্তন করার জন্য, ৪. সম্প্রদায় তৈরি বা প্রতিপালনের জন্য, ৫. নিরাময় করতে, ৬. শিক্ষাদান বা রাজি করার জন্য, এবং ৭. পবিত্র এবং শয়তানদের মোকাবেলা করতে। উক্ত উদ্দেশ্যসমূহের কোনটি যে প্রধান তা বলা কঠিন। সমাজের প্রয়োজনে একটি উদ্দেশ্য অন্য উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত। শেখনারের উল্লেখিত ছকটি গুরুত্বের দাবি রাখে। দেখা যায় একটি উদ্দেশ্য অন্য উদ্দেশ্যের সাথে স্তরায়িত হয়ে বিস্তার লাভ করেছে। নাট্য যেমন বিনোদন প্রদানের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে তার সাথে সাথে সৌন্দর্য সৃজন করা হয়ে থাকে। একটি সমাজকে পরিচিত করে তোলে সেই সমাজের কর্মকাণ্ড। সমাজের প্রতিটি অভিকরণের সমন্বয়ে সেই সমাজ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা হয়ে থাকে। সমাজের আত্মপরিচয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যেও সমাজের অভকরণ হয়ে থাকে। প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থা তার নিজস্ব কর্মকাণ্ডের কারণে অন্য সমাজ হতে তার নিজস্বতা তৈরিতে সক্ষম হয়ে থাকে। আমাদের চার পাশের সমাজের বৈচিত্র্যতা দেখলেও বোঝা যায় তাদের পৃথক হবার কারণ। এই দলবদ্ধতার কারণে নিজেদের আত্মপরিচয় সমন্বিত রাখতেও অভিকরণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। মানুষ এমন প্রাণী যাদের শুধুমাত্র পাকস্থলী পূর্ণ হলেই আত্মতৃপ্ত থাকতে দেখা যায় না। প্রতিনিয়ত জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি মানুষ নানা অভিকরণের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। মানবিক বোধ থাকার ফলেই মানুষ অন্য প্রাণীর চেয়ে পৃথক। মানুষ কথা বলতে পারে, চিন্তা করতে পারে, অতীত-ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে পারে, পরিকল্পনা করতে পারে। এই সক্ষমতাসমূহের কারণে মানুষ যেমন প্রাণী জগতে পৃথক এবং নিজেদের বুদ্ধিমত্তা উপস্থাপন করতে সক্ষম ঠিক তেমনি মানুষ মানসিকভাবে অসুস্থও হয়ে পরতে পারে। অভিকরণ এই মানসিক চাপবোধ এবং অসুস্থতা থেকে নিরাময়লাভে সাহায্য করতে সক্ষম। অভিকরণ সামাজিক জীবনে শিক্ষালাভের মাধ্যম হয়ে উঠতে সক্ষম। অভকরণের মাধ্যমে সামজিক মূল্যবোধ এবং সমাজের প্রয়োজনে ব্যক্তিকে সক্ষম করে গড়ে তুলতে অভকরণ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। মানুষ পরম্পরার জ্ঞানের মাধ্যমে সমাজে অভিযোজন এবং পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন সাধন করে থাকে। এই পরম্পরার জ্ঞান লাভে অভিকরণ যথার্থ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। পরিশেষে জীবন উপলব্ধি করতে, সত্য-মিথ্যে চিনতে অভিকরণ ভূমিকা পালন করে।

বর্তমান সময়ে ময়মনসিংহ শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় দ্বিজ কানাইয়ের *মহুয়া* যখন দৃশ্যকাব্য আকারে মঞ্চ উপস্থাপন হচ্ছে, সেই প্রেক্ষিতে নারীকেন্দ্রিক পুরুষের চিন্তার বীজ ১৬৫০ সালের (পালাটি লিখিত হয় বলে গৃহীত) তুলনায় বর্তমানের নারীর উন্নয়ন বা দার্শনিক ভাবনায় নারীর অবস্থান নির্ণয় করে সমকালীন নারী উন্নয়নের রূপরেখা নির্ধারণ করা যেতে পারে প্রণীত এ গবেষণার মাধ্যমে।

"ময়মনসিংহ গীতিকা'র মহুয়া নাট্য প্রযোজনায় নারীর প্রতিরূপায়ণ'' শিরোনামের গবেষণাকর্মের মূল লক্ষ্য হলো নাট্যসাহিত্য এবং প্রযোজনার তুলনামূলক বিশ্লেষণপূর্বক বর্তমান সময়ের নারীদের অবস্থান অনুসন্ধান। সাহিত্য, সৃজনশীল শিল্পকর্ম ও নাটক যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তার উপাদান সংগ্রহ করে থাকে। আবার শিল্পচর্চাও ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা, দর্শন এবং জীবনচর্চায় প্রভাব ফেলে। এজন্য অভিনেতা এবং চরিত্রের ব্যক্তিজীবনের অবস্থান হুবহু না হলেও অধিকাংশ সময়ে সহবস্থান করে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত চক্রে দেখা যায়,

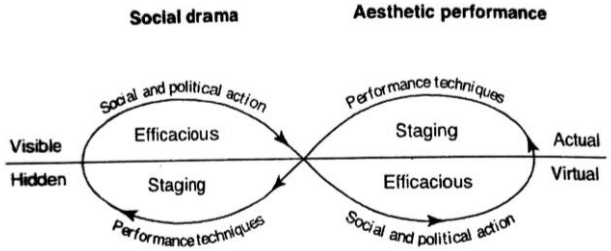

fig 5.20. The mutual positive feedback of social dramas and aesthetic performances. Drawing by Richard Schechner.

(Schechner, p.156)

শেখনারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী পরিলক্ষিত হয় সমাজের প্রচলিত/দৃশ্যমান বিষয়াদি নাট্যে ভূমিকা পালন করে, আবার নাট্যিক জগতের অভিজ্ঞতাও সমাজে প্রভাব রাখে।

দ্বিজ কানাই প্রণীত *মহুয়া* পালা ১৬৫০ সাল নাগাদ রচিত হওয়ায় এই পালার মাধ্যমে তৎকালীন নারী সম্বন্ধে পালাকারের ধারণার পাশাপাশি নাট্যে বিভিন্ন চরিত্র এবং নাট্যের অভিনেতা- অভিনেত্রীর কথোপকথনের মাধ্যমে নারী সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা সম্ভব। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই পালাটি রচিত এবং বর্তমানে পালাটি এই অঞ্চলে চর্চিত হচ্ছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে এখন নারী সম্বন্ধে কী ধারণা বিদ্যমান এবং *মহুয়া* নাট্যসাহিত্য অনুযায়ী যে নারীভাবনা রয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য অনুসন্ধান করলে বর্তমান নারীদের অগ্রযাত্রা যে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করে নি সে বিষয়ে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের মাধ্যমে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। মূলত গবেষণায় পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ, নাট্য প্রযোজনাসমূহ ব্যাখ্যা এবং নাট্যদলসমূহের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উক্ত লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রাপ্ত তথ্য এবং ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ গীতিকা ময়মনসিংহ অঞ্চলের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ড. দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত চার খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রথম খণ্ডে যে দশটি পালাগান স্থান পেয়েছে সেগুলোই ময়মনসিংহ গীতিকা বলে স্বীকৃত। এই দশটি পালার প্রায় সবগুলোতেই নারী চরিত্রের অবস্থান প্রকাশ ও এ অঞ্চলের মানুষদের নারী সম্বন্ধীয় চিন্তা ও দর্শনের ইঙ্গিত বিদ্যমান। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করলে রোঁমা রোঁলা, মরিস মেটার লিংক, সিলভাঁ লেভি ও জর্জ গ্রায়ারসনের মতো মনীষী তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে পুরো বিশ্বের কাছে ময়মনসিংহ অঞ্চল তথা বাংলাদেশ সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করা সম্ভব হয়। সুতরাং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে *মহুয়া* পালা বিশ্লেষণ গুরুত্বের দাবী রাখে।

দিলু বয়াতী, নেত্রকোনা ২০১৮(*মহুয়া* পালার স্থিরচিত্র)

পূর্ববঙ্গ গীতিকার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ধর্ম নিরপেক্ষতা। শুধু যেকোনো বিশেষ ধর্মমতের প্রতিফলন এতে ঘটেছে তাই নয়; বরং নর- নারীর যে প্রণয়াবেগ, ধর্মব্যঞ্জন ও সামাজিক শাসন অস্বীকার এই সব গীতিকায় তা প্রকাশ্য। দ্বিজ কানাই প্রণীত 'মহুয়া' পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রেমাস্পদের জন্য মহুয়ার অপরিসীম কষ্ট স্বীকার ও আত্মত্যাগ গৌরবময় উদাহরণ এই গীতিকার মূল আখ্যান। লক্ষণীয় বিষয়, গীতিকাগুলোতে নারীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নারীর প্রেমনিষ্ঠা চরিত্রকে মোহনীয় করে তুলেছে যা গীতিকার নারী চরিত্রকে শুধু দীপ্ত করে তুলে নি, তার ব্যক্তিত্বেরও বিকাশ ঘটিয়েছে।

ড. সোমা মুমতাজ; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানে ময়মনসিংহ অঞ্চলের একাধিক নাট্যদল ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন পালা মঞ্চায়িত করে আসছে। ময়মনসিংহ শহরেই *মহুয়া* প্রযোজনাটিই নিয়মিত এবং সক্রিয়ভাবে মঞ্চে উপস্থাপন করছে কমপক্ষে ৩টি নাট্যদল। এছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরে, বিশ্ববিদ্যালয়সহ নানান ক্ষেত্রে *মহুয়া* পালা প্রযোজিত হচ্ছে। করোনাকালীন সংকটের কারণে অধিকাংশ নাট্যদল এ পালাগুলো উপস্থাপনে অনিয়মিত; তন্মধ্যে গবেষণার স্বার্থে নির্ধারিত নাট্য দলসমূহের পরিবেশনার ধরণ পর্যবেক্ষণ এবং পালাগুলোর প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করে তাত্ত্বিক কাঠামোর ছকে ফেলে আহরিত প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ মারফৎ *মহুয়া* দৃশ্যকাব্যটি পরিবেশনার কার্যকারিতা উপলব্ধিসহ নাট্যিক রূপরেখা অনুসন্ধান করা হয়েছে এ গবেষণায়।

মোঃ আল জাবির; জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩

বাংলা সাহিত্যে *মহুয়া* ময়মনসিংহ গীতিকার অংশ হিসেবে সাহিত্যিক শিল্পমূল্য, আঙ্গিক বিশ্লেষণ, সমাজ বাস্তবতায় সমকালীন নারীর অবস্থান, প্রেমিকা হিসেবে নারী, প্রেমে নারীর আত্মবিসর্জন কিংবা প্রণয়- উপাখ্যান হিসেবে বহুবিধ আলোচনা হয়েছে। এই পালা সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনায় সমকালীন সমাজে শ্রেণি বৈষম্য, মধ্যযুগীয় প্রেমের আখ্যান কিংবা মঙ্গল কাব্যের ধারায় লোকসাহিত্যের উপাদান অন্বেষণ স্থান পেয়েছে। পাঠক ও দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী সেখানে চরিত্র চিন্তন হিসেবে এসেছে। যদিও, একটি প্রযোজনায় দর্শক কিংবা নাট্য সমালোচকের দৃষ্টিতে নারী চরিত্র শুধু সাহিত্যের অংশ হিসেবে নয়, রূপায়িত অভিনেত্রীর প্রেক্ষাপট এবং পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য মূল্যের অধিক অর্থ দ্যোতনায় সক্ষম হতে পারে। নারী সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পারে। দৃশ্যকাব্যের সেই সম্মোহন শক্তি রয়েছে। এক্ষেত্রে এই নাট্য বিশ্লেষণ দৃশ্যকাব্য প্রতিরূপায়ণে নারীতত্ত্বের আলোকে বর্তমান বৈশ্বিক নারীর পটভূমি নির্ধারণে সহায়তা কিংবা দিকনির্দেশনা দিতে পারে। এই গবেষণা নাটকের প্রযোজনাগত উপস্থাপন, রীতি অনুযায়ী নারী চরিত্র প্রতিরূপায়ণ, বিশ্লেষণ, *মহুয়া* পালার জন্য এবং সামগ্রিক জ্ঞানতত্ত্বে মৌলিক জ্ঞান সঞ্চার করেছে বলে মনে করি। ব্যক্তিজীবনে নারী এবং পালাকারের নারীর তুলনামূলক বিশ্লেষণে বোঝা যায় অতীত থেকে বর্তমানে বিবর্তনের ধারায় রচিত নারীর নতুন কিংবা অপরিবর্তনীয় বয়ান।

গবেষণার অনুসৃতব্য কৌশল/ পদ্ধতি

গবেষণাকর্মটি যেহেতু পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ এবং প্রযোজনা পর্যবেক্ষণ দুই প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে সেহেতু এখানে গবেষণার প্রকৃত ফলাফল আনয়নে পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ ও প্রযোজনার পার্থক্য নিরূপণে সাহিত্য গবেষণার অংশ হিসেবে তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতি কার্যকর বলে মনে করি।

তথ্য সংগ্রহ

প্রাথমিক উৎস

অভিনয় পর্যবক্ষেণ, অভিনেতা- অভিনেত্রী, নির্দেশক এবং দলপ্রধানসহ বিজ্ঞজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বৈতায়িক উৎস

গবেষণায় তথ্য চিত্র, অভিনয় পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য উৎস, বই, দৈনিক সংবাদ পত্র, বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক প্রকাশিত পত্রিকা, প্রকাশিত

জার্ণাল, বাংলাদেশ আর্কাইভ, বাংলা একাডেমি সংগ্রহশালা, বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গবেষণা বা চর্চা কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বর্তমানে ময়মনসিংহ শহরের উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, একাডেমি অব ফাইন আর্টস এবং বহুরুপী নাট্যসংস্থা নামের ৩ টি দল *মহুয়া* প্রযোজনা মঞ্চে উপস্থাপন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও এই পালাটি মঞ্চায়িত হয়েছে।

এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে উপরোক্ত ৩টি নাট্যদল বিগত দুই দশক ধরে নাট্যচর্চায় সংযুক্ত আছে। উল্লেখ্য যে, করোনাকালীন সংকটের কারণে তাদের উপস্থাপনা আপাতত স্থগিত রয়েছে। এই নাট্যদলগুলির নাট্য উপস্থাপনে পাণ্ডুলিপি থেকে মঞ্চায়ন, প্রত্যেকটি ধাপে নারীর প্রতিরূপায়ণকে পর্যবেক্ষণ এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক তার ব্যাখ্যা করে নারী সম্বন্ধীয় ধারণা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। করোনাকালীন সংকটে নাট্যদলসমূহ প্রযোজনাটি মঞ্চায়নে অসমর্থ হওয়ায় তাদের ধারণকৃত নাট্যের ভিডিও ব্যাখ্যা এবং একান্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কার্যকর তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণা পরিচালনা

পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ, অভিনয় পর্যবেক্ষণ, দলের কলাকুশলীদের সাক্ষাৎকার, পরিচালকের সাক্ষাৎকার, পরিচালকের পরিচালনা নীতি ও উপস্থাপন ধরণ (demonstration) পর্যবেক্ষণ করা ও একই সাথে তাদের কাছে অতীতে মঞ্চায়িত উক্ত প্রযোজনার ভিডিও চিত্র আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে, এছাড়া নাট্যিক উপাদানের প্রয়োগ বিশ্লেষিত হয়েছে।

গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয় সমূহের ব্যাখ্যা

উপস্থাপিত গবেষণার শিরোনাম "ময়মনসিংহ গীতিকা'র *মহুয়া* নাট্য প্রযোজনায় নারীর প্রতিরূপায়ণ" - যার প্রত্যয় ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করলে মূলত ময়মনসিংহ গীতিকা, *মহুয়া* নাট্য এবং সমকালীন প্রযোজনায় নারীর প্রতিরূপায়ণ তিনটি প্রত্যয় উঠে আসে। পর্যায়ক্রমিক প্রত্যয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হল।

ময়মনসিংহ গীতিকা

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রাচীন পালাগানের সংকলনকে ময়মনসিংহ গীতিকা (মৈমনসিংহ গীতিকা) বলে আখ্যায়িত হয়। উক্ত গীতিকা সংকলনে মূলত ১০টি পালা স্থান পেয়েছে। যার মধ্যে দ্বিজ কানাই প্রণীত *মহুয়া* পালা, বংশীদাস কন্যা চন্দ্রাবতী প্রণীত পালা *মলুয়া*, দ্বিজ ঈশান প্রণীত *কমলা* পালা, বংশীদাস কন্যা চন্দ্রাবতীর প্রণীত *দস্যু কেনারাম* পালা, নয়াচাদ ঘোষ প্রণীত *চন্দ্রাবতী, কঙ্ক ও লীলা* পালার পালাকার হিসেবে ধারণা করা হয় রঘুসুত, দামোদর, শ্রীনাথ, নয়ানচাদ ঘোষ এই চারজনকে, মনসুর বয়াতি প্রণীত *দেওয়ান মদিনা* পালা, *জয়চন্দ্র* পালা, *রূপবতী, কাজলরেখা* ও *দেওয়ান ভাবনা* পালার পালাকার সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না। বলাবাহুল্য ময়মনসিংহ গীতিকা মূলত বর্ণনাত্বক রীতিতে পরিবেশিত হয় যেখানে প্রচুর নাটকীয় ঘটনার বিবরণ ও চরিত্রের উক্তি- প্রত্যুক্তি থাকে।

মহুয়া নাট্য

মহুয়া নাট্য বলতে এই গবেষণায় ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত দ্বিজ কানাই রচিত *মহুয়া* পালাকে বোঝানো হয়েছে।

নারীর প্রতিরূপায়ণ

নারীর প্রতিরূপায়ণ বলতে আলোচ্য গবেষণায় ডব্লিউ, জে, টি, এইচ মিচেল প্রবর্তিত প্রতিরূপায়ণ তত্ত্বের আলোকে দ্বিজ কানাই রচিত *মহুয়া* পালা পাণ্ডুলিপির নারী এবং *মহুয়া* প্রযোজনার নারী চরিত্রের সাথে বাস্তবের নারীর প্রতিরূপায়ণ বোঝানো হয়েছে।

যেকোনো গবেষণা সম্পাদনের জন্য তত্ত্বীয় হাতিয়ার অত্যন্ত জরুরী। তত্ত্বীয় কাঠামোর মাধ্যমেই একটা গবেষণাকে সর্বজনগ্রাহী এবং যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। এ গবেষণা কর্মটির তত্ত্বীয় হাতিয়ার হিসেবে বিভিন্ন নারীবাদী তত্ত্বের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ডব্লিউ, জে, টি, এইচ মিচেল প্রবর্তিত প্রতিরূপায়ণ তত্ত্বের আলোকে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নারীবাদ এবং নারীবাদী তত্ত্ব বোঝা গেলে নারী সম্বন্ধীয় ধারণা প্রাপ্তি সম্ভব। আলোচ্য গবেষণা পরিচালনায় মহুয়া চরিত্র বিশ্লেষণে নারীবাদী তত্ত্ব যেমন জানা প্রয়োজন তেমনি এর ইতিহাস জানাও জরুরী। বর্তমানের নারীবাদ এবং এ বিষয়ক তত্ত্ব একদিনে আসে নাই, এর পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথ।

> "নারীবাদ" শব্দটি ইংরেজি (feminism) শব্দের বাংলা পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অক্সফোর্ড অভিধানে 'ফেমিনিজম' শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'Belief in the principle that women should have the same rights and opportunities (legal political, social, economic etc) as men. অর্থাৎ মানুষ হিসেবে নারীও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধার সমভাগীদার। "নারীবাদী" শব্দের উৎপত্তিকাল ১৮৫২ এবং "নারীবাদ" শব্দের ক্ষেত্রে তা ১৮৯৫। নারীবাদী শব্দ দুটি ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে, যুক্তরাজ্যে ১৮৯০ সালে এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১০ সালে।
>
> Terms of the late 19th to designate, ideas that underlie modern movement in the favor of rights for women. It includes the personal and social as well as the political and economic aspects of the movement and has for its object the placing of women on complete equality with men. (হাসান, ২০১৬, পৃ: ৮০)
>
> নারীবাদী তত্ত্ব হলো নারীবাদকে তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক রূপ দেয়ার প্রয়াস। এটি জ্ঞানের অনেকগুলি শাখা যেমন নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, উইমেন স্টাডিজ, নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা, শিল্প ইতিহাস, মনোঃসমীক্ষণ এবং দর্শনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। নারীবাদী তত্ত্ব লিঙ্গবৈষম্যকে বোঝার চেষ্টা করে এবং 'জেন্ডার' রাজনীতি, ক্ষমতার সম্পর্ক ও 'সেক্সুয়ালিটি'র উপর গুরুত্ব দেয়। এই সামাজিক এবং রাজনৈতিক জটিল সম্পর্কগুলো ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি নারীবাদী তত্ত্ব নারীদের অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে। নিপীড়ন, এবং পুরুষতন্ত্র এই বিষয়গুলো নারীবাদী তত্ত্বের প্রতিপাদ্য। কালের পরিক্রমায় অনেক নারীবাদী আন্দোলন এবং আদর্শ তৈরি হয়েছে যেগুলোর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং লক্ষ্য উপস্থাপন করে। (উইকিপিডিয়া)

সুতরাং নারীবাদী দর্শন বহুমাত্রিক আলোচনার বিষয়। মূলত সামগ্রীক জীবনাচরণকে এই দর্শনের অন্তর্ভূক্ত বলা যেতে পারে।

> সময়কাল, সংস্কৃতি ও দেশভেদে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নারীবাদীরা বিভিন্ন কর্মসূচী ও লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করেছেন। অধিকাংশ পাশ্চাত্য নারীবাদী ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, যে সমস্ত আন্দোলন নারীর অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করেছে তাদের সব কয়টিকেই নারীবাদী হিসেবে গণ্য করা উচিৎ। অন্য ঐতিহাসিকগণেরা মনে করেন 'নারীবাদী' শব্দটি শুধুমাত্র আধুনিক নারীবাদী আন্দোলন ও তার উত্তরসূরী আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই দ্বিতীয় দলের ঐতিহাসিকরা পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলোকে চিহ্নিত করতে "উপনারীবাদ" কথাটির অবতারণা করেছেন। (উইকিপিডিয়া)

নারীবাদী এই ধারণার প্রকাশ এবং চর্চার রয়েছে নানা ধাপ। সময়ের পরিক্রমায় নানা রূপ লাভ করেছে নারীবাদী দর্শন।

'উনিশ শতকের গোঁড়ার দিকে ১৯১২ খ্রিঃ ৬ই মে নিউইয়র্ক সিটির রাস্তায় নারীর ভোটাধিকারের দাবীতে মূলত নারীমুক্তি আন্দোলনের শুরু হয়। ১৮৬৭ সালে জন স্টুয়ার্ড মিল সংসদে নারীদের ভোটাধিকারের পক্ষে প্রথম বক্তৃতা করেন। তার বক্তৃতায় তিনি পরিবার এবং সামাজে নারীপুরুষের সাম্যের জন্য প্রবলভাবে দাবি জানান। (বোভেয়ার, ২০০১)

পূর্বে নারীবাদ বলতে কেবলমাত্র নারীত্বের গুণগত দিককে নির্দেশ করা হতো কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে নারী- অধিকার রক্ষার বিষয়টিকে নারীবাদের সাথে যুক্ত করা হল। নারীবাদ বলতে এখন নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি সহাবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। (খানম, ২০০৭, পৃ: ২৫৩)

মানুষ হিসেবে পুরুষের তুলনায় সর্বার্থে নারীর সমতা ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে নারীবাদ। তাই বলে পুরুষ বিচ্ছিন্ন একক নারী জগতের ধারণার সাথে বর্তমান নারীবাদের কোন যোগসূত্র নাই। নারীবাদ নারী বিষয়ক দিক তুলে ধরতে চায়। সমাজে নারীর সমতা অর্জন, বিশেষ করে পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের যৌক্তিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। নারীবাদ দাবী করে: নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকে মূলোৎপাটন করা নারীবাদের আদর্শ। নারী পুরুষের তুলনায় একদিকে সক্ষম অন্যদিকে সামাজিক অবদানের দিক দিয়ে সে ঐতিহাসিকভাবেই পুরুষের তুলনায় বঞ্চিত। এর মূল লক্ষ্য সমাজে বিদ্যমান লৈঙ্গিক বৈষম্যের অবসান। নারীবাদী কর্মকাণ্ড সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রদত্ত বিভিন্ন মতবাদ ও আন্দোলনকে নির্দেশ করে। নির্বাচনী ভোটাধিকার, উত্তরাধিকারী সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বৈবাহিক জীবনে সমানাধিকার, রাজনীতি ও ব্যবসায় সমান সুযোগ, সমান কাজে সমান বেতন, মাতৃত্ব- অবসর অর্থাৎ নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। সমাজে নারী- পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ যেসব অন্যায়ের স্বীকার হচ্ছে সেসব অন্যায়ের বিনাশ করতে পারলে কেবল নারী সুফল পাবে তা নয়, সকল মানুষই অন্যায়মুক্ত সমাজ পাবে বলে নারীবাদী প্রবক্তাদের দাবী করে। (খানম, ২০০৭, পৃ: ২৫৪)

স্ট্যান্ডপয়েন্ট তত্ত্ব নারীবাদী তাত্ত্বিকদের তাত্ত্বিক ভিত্তি, যেখানে বলা হয় ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান তার জ্ঞান আরোহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তি দেয়া যে, বিদ্যমান গবেষণা এবং তত্ত্বগুলো নারী এবং নারীবাদী আন্দোলন গুরুত্বহীন হিসেবে উপস্থাপন করে এবং পক্ষপাত শূণ্য হিসেবে তুলে ধরেছে বলে দাবী করে। বর্ণবাদ, হোমোফোবিয়া, শ্রেণিবাদ, উপনিবেশবাদ কিভাবে লিঙ্গবৈষম্যকে প্রভাবিত করে তা বোঝার জন্য ১৯৮০ এর দশক থেকেই স্টান্ডপয়েন্ট নারীবাদীগণ বলে আসছেন যে, নারীবাদী আন্দোলনে আন্তজার্তিক সমস্যা (যেমন ধর্ষণ, অযাচার, পতিতাবৃত্তি) - এর পাশাপাশি সাংস্কৃতিকভাবে সৃষ্ট সমস্যা (যেমন আফ্রিকায় ফিমেল জেনিটাল মিউটিলেশন, আরব বা মধ্যপ্রাচ্যে নারীদের সামাজিক বাঁধা নিয়ে কাজ করা দরকার। (উইকিপিডিয়া)

ম্যারি ওলস্টোন ক্রাফটের (১৭৫৯- ৯৭) 'ভিন্ডিকেশন অব দি রাইটস অব ওম্যান' (১৭৭১), ভারজিনিয়া উলফের (১৮৮২- ১৯৪১) 'অরল্যান্ডো (১৯২৮), সিমোন দ্যা বোভেয়ার (১৯০৮- ৮৬), দ্যা লাজিয়াম সেক্স (১৯৪৯), জন স্টুয়ার্ড মিলের (১৮০৬- ৭৩) দ্য সব্জেকশন অফ ওম্যান (১৮৬৯), বেটি নোয়ামি ফ্রাইডান (১৯২১- ২০০৫) এর ফেমিনিন মিস্টিক (১৯৬৬), কেট মিলেট এর সেক্সচুয়াল পলিটিক্স (১৯৬৯) ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে নারীবাদী তত্ত্বের সামগ্রিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে। (হাসান, ২০১৬, পৃ: ৮০- ৮২)

নারীবাদী আন্দোলনের ইতিহাস

নারীর ভোটাধিকার পরবর্তী, সমঅধিকার এবং যাপিত জীবনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার সারা বিশ্বের মতো প্রাচ্যেরও সংকট বলে মেনে নিতে বাঁধা নেই। নারীবাদ নারীকে নিয়ে যে নৈতিক অবস্থান নির্মাণ করতে চায় তা স্থান কাল ভেদে পরিস্থিতির জন্য নানা বিধ সংকটের মোকাবেলা করে চলেছে।

উনিশ শতকের শুরুর দিকের কতগুলো কার্যকলাপের ধারাবাহিকতাকে নারীবাদের প্রথম ঢেউ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এসময়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে চুক্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার, বিবাহ, বাচ্চার দেখভাল এবং নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার নিয়ে আন্দোলন চলছিলো। উনিশ শতকের শেষের দিকে এ আন্দোলন নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন, বিশেষভাবে নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলনে পরিণত হয়, যদিও কিছু নারীবাদীগণ তখনো নারীদের লিঙ্গগত, পূনঃউৎপাদনমূলক এবং অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন। এছাড়াও এ শতকের শেষের দিকে ব্রিটেনের অস্ট্রেলিয়ান উপনিবেশগুলোতে নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলন ছড়িয়ে পরে। যেসব উপনিবেশ নিউজিল্যান্ডের স্ব- শাসিত অবস্থায় ছিলো।সেগুলোতে ১৮৯৩ সালে নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয় এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ১৮৯৫ সালে নারীদের ভোটাধিকার এবং পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দেয়। পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়া ১৯০২ সালে নারীদের ভোটাধিকার প্রবর্তন করে। বৃটেনে ভোটাধিকার আন্দোলনকারীরা নারীদের ভোট দেয়ার অধিকারের স্বপক্ষে প্রচার শুরু করে। ১৯১৮ সালে রিপ্রেসেন্টেশন অফ পিপল অ্যাক্ট পরিবর্তনের মাধ্যমে কমপক্ষে ৩০ বছর বয়সী নারী যাদের সম্পত্তি আছে তাদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। ১৯২১ সালে এই আইন সংশোধন করে ২১ বছরের বয়সী সকল নারীর জন্য ভোটাধিকার প্রবর্তন করা হয়। এমিলিন প্যাঙ্কহার্স্ট ছিলেন ইংল্যান্ডের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অ্যাক্টিভিস্ট। নারীবাদী আন্দোলনে তার ভূমিকা স্মরণীয়। ১৯১৯ সালের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৯তম সংশোধনীর সাথে সাথে নারীবাদের প্রথম ঢেউ শেষ হয়েছে বলে মনে করা হয়, কেননা এ সংশোধনীতে ১৯২০ সালে নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। (হাসান, ২০১৬, পৃ: ৮০)

নারীবাদীরা নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউ এর যুগে প্রবেশ করেন যেখানে সামাজিক ও সংস্কৃতিগত বৈষম্য এবং রাজনৈতিক অসমতার বিষয়গুলো সামনে আসে। বিশ শতকের মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৯৬০ থেকে ৭০ এর দশকে এসে নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়। ইউরোপের অনেক দেশেই নারীবাদীরা তখনো ভোটাধিকার নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। এরমধ্যে নারীবাদীরা পারিবারিক আইন সংশোধনের জন্য লড়াই করতে থাকে। এছাড়াও নারীবাদীরা ধর্ষণ আইনে "বৈবাহিক অব্যাহতি" তুলে নেয়ার জন্য লড়াই করছিলেন। নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউয়ে এসে ফরাসি দার্শনিক সিমোন দ্য বোভেয়ার- এর 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' (১৯৪৯) বইটি নারীবাদী দর্শনের বাইবেল বলে পরিগণিত হয়।

১৯৭০ সালের দিকে নারীবাদী তত্ত্ব ও আন্দোলনের প্রধান স্লোগান ছিল ক্যারল হানিসচ এর 'পার্সোনাল ইজ পলিটিক্যাল' প্রবন্ধ। এই স্লোগানের মূল কথা হল, ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই, সবই সমাজ ও রাজনীতির অংশ। জীবনের কোন অংশই রাজনৈতিক বিশ্লেষণের উর্ধে নয়। (সরকার, ২০১০)

নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউয়ে নারীর ব্যক্তিজীবন, যৌন স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও নারীর পারিবারিক জীবন, মাতৃত্ব, সন্তান লালন- পালন, ভ্রূণ হত্যা, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার, বৈবাহিক ধর্ষণ, সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পর্ক, পারিবারিক আইন, বাইরে কাজের স্বাধীনতা নিয়ে নারীবাদীরা এসময় চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকেন। অর্থাৎ, নারীদের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাগুলো যে রাজনৈতিক এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সৃষ্ট সে ধারণা প্রকাশ পায়। নারীরা এ সময়ে পুরুষ আধিপত্যের হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছিল। ৮০- এর দশকে পরিবার ও সন্তান নিয়ে নেতিবাচক মতামত পাল্টাতে থাকে। তখন মনে করা হয় নারীর যৌন জীবন তার আত্ম প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় নয় বরং আনন্দের উৎস হিসেবে দেখানো হয়েছে। (মাসুদুজ্জামান, ২০০৭, পৃ: ৪০- ৪২)

১৯৯০ এর শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে নারীবাদের তৃতীয় ঢেউয়ের ছোঁয়া লাগে যা দ্বিতীয় ঢেউ এর সময়কালীন উদ্যোগ এবং সংগ্রামগুলোর পরবর্তী ধাপ হিসেবে দেখা হয়।

গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে আত্মঅধিকার ও আত্মরক্ষার তাগিদে নারীরা যে সংগ্রাম শুরু করেছিল এ সময়ে এসে নারীর সঙ্গে নারীর সম্পর্ক স্থাপনে তা বিশেষ ভুমিকা পালন করে। জাতিসংঘ এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আন্তর্জাতিক নারী দশক এবং সম্মেলনের আয়োজন করে। এর প্রভাবে নারীরা কাছাকাছি চলে আসে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের নারীরা ভগ্নিভাবাপন্ন একটি পরিবেশ গড়ে তোলে যার মূল কথা হল সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা। নারী সমকামীতা নিয়ে এ দশকে এসে নারীদের হেটেরোসেক্সুয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। সেই সাথে পুরুষ সমকামিতার বিষয়গুলো সামনে আসতে থাকে। এ দশকে এসে নারীবাদীরা পরস্পরকে সাহায্য করতে চেয়েছে দুইভাবে, রাজনৈতিক উদ্যোগ এবং মনোঃসমীক্ষণধর্মী তত্ত্বের মাধ্যমে। এ সময় তারা যৌনতার সাথে রাজনীতি এবং সাহিত্যে যৌনতার রাজনীতিতে পুরুষের কর্তৃত্ব বজায়ের সমালোচনা করেন। প্রজননের সাথে নারীর শ্রম বিভাজনের বিষয়টি সামনে চলে আসে। সমালোচনা হয় নারীর সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দৃশ্যমাধ্যমে নারীকে পণ্যকরণে পুরুষের ক্ষমতা প্রদর্শন এবং যৌনতার বিকৃত রূপ। যাকে এ সময়ের লেখক লরা মালভি 'মেল গেজ' বা পুরুষের নিস্পলক দর্শন বলে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় ঢেউয়ে বিভিন্ন নারীবাদের পার্থক্য, সমাজে নারী এবং পুরুষের ভিন্নতা, জেন্ডার ভূমিকা, বর্ণবাদ, ধর্ষণ এবং পতিতাবৃত্তি নিয়ে আলোচনা হয়। (মাসুদুজ্জামান, ২০০৭, পৃ: ৪৪- ৪৬)

পারিপার্শ্বিকতার কারণে নারীর লড়াইয়ের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটলেও এই পুরুষশাসিত সমাজে নারীর কিন্তু লড়াইটা চালিয়েই যেতে হচ্ছে। ১৬৫০ সালে রচিত *মহুয়া* নাট্যে মহুয়া যেমন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছে এবং নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ব্যর্থ হওয়ায় আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে বর্তমানেও তেমনটি হরহামেশাই ঘটতে দেখা যায়। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে শুধু প্রেমে অপ্রাপ্তি মূখ্য নয় বর্তমানের নারীদের সংকট নানাবিধ শাখার বিস্তার ঘটিয়েছে।

বাংলাদেশে নারীবাদ

বাংলাদেশের নারীবাদী চর্চা দেশের জন্মলগ্ন থেকেই পরিলক্ষিত হয়, যদিও যুদ্ধ পরবর্তী একটি দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে দেশের প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করাই মূখ্য ছিলো। পরবর্তীতে বাংলাদেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে নারীর প্রতি বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হতে থাকে একই সাথে পৃথিবীব্যাপী নারী আন্দোলনের জোয়ারের প্রভাব বাংলাদেশেও পড়তে শুরু করে।

> ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক নারী-আন্দোলনের চাপে এবং অভ্যন্তরীণ নারীসমাজের দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের ফলে যখন নারীদের সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকা সম্ভব হয় নি, অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই এদের মধ্যে থেকে আপাতভাবে নারীমুক্তিতে বিশ্বাসী এ রকম কিছু অঙ্গসংগঠন গড়ে ওঠে। এ সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে বা পরিচালনায় যারা আছেন তারা সম্পূর্ণ প্রশ্নাতীতভাবে শরিয়তের বিধান মেনে চলার উপর গুরুত্ব দেন। তাঁদের মতানুযায়ী একমাত্র তাতেই নারীর মুক্তি আসবে। . . . অবরোধ প্রথার পুনঃপ্রচলন এবং নারীর তালাকের অধিকার ফিরিয়ে নেয়ার পক্ষেও তারা জোর প্রচার চালান।... তারা উত্তরাধিকারে নারীর সমান অংশ পাওয়া, অথবা তালাকপ্রাপ্ত অসহায় নারীর পুনর্বিবাহ না করা পর্যন্ত ভরণপোষণের আদেশেরও তীব্র বিরোধিতা করে থাকেন। (কামাল, ২০১০, পৃ: ৬৫)

> ২০১০ সালে প্রকাশিত 'নারী, মানবাধিকার ও রাজনীতি' নামক বইয়ে লেখিকা সুলতানা কামাল বলছেন, আজও এই পনেরো বছরের নারী আন্দোলনের সাফল্যের পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, বাংলাদেশে বর্তমানে নারী সংগঠনের সংখ্যাই দাঁড়িয়েছে ৭০০-তে। এ দেশের নারীসমাজ যা অর্জন করেছে তা হচ্ছে প্রশাসনিক কাঠামোতে মহিলা মন্ত্রক ও মহিলা পরিদপ্তর। প্রণীত হয়েছে যৌতুক বন্ধের আইন, বিবাহ বিচ্ছেদে নারীর অধিকার, নারী-হত্যা এবং নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য শাস্তিমূলক আইন, পারিবারিক আদালত। কিন্তু এসব অপরাধকে জামিন অযোগ্য ঘোষণা করা হয়নি। তাই শক্তিশালী অপরাধী ছাড়া পেয়ে যায় সহজেই। যৌতুকবিরোধী মামলায় বিবাহের দানসামগ্রীকে যৌতুক বলে প্রমাণ করার উপায় কী? এ ধরনের নানা দূর্বলতায় নারীসমাজ এসব আইনের সুযোগ নিতে পারে না। তার উপর রয়েছে মানসিকতার প্রশ্ন। সামাজিক ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আদালতে যাওয়ার সৎ সাহস অর্জন করা কি সহজ? এতোদিনের সংগ্রামের পরেও তো নারীকে মনে করা হয় সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র, ভোগের সামগ্রী। (কামাল, ২০১০, পৃ: ৭০)

আলোচ্য মহুয়া প্রযোজনায়ও উক্ত মতের প্রতিফলন দেখা যায়। প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু সামাজিক এবং পারিবারিক শিষ্টাচার পালন করা জরুরী। পরিবারে নারীও সে নিয়ম পালন করে থাকে, তবে প্রচলিত সমাজে

পুরুষের তুলনায় একটু বেশি বিধি-নিষেধের মধ্য দিয়েই তাকে বেড়ে উঠতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই নারী তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে না। সিদ্ধান্ত নিলেও সে অনেক ক্ষেত্রেই কর্তার চাপিয়ে দেয়ার পক্ষে কাজ করে। পরিবারে পুরুষ কর্তা অর্থ আনয়ন করে বলেই হয়তো নারীর প্রতি পুরুষের এ আধিপত্য, কিন্তু বেদে সম্প্রদায়ের মধ্যে নারী পরিবারের অর্থ আনয়ন করলেও নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা তার নেই। মহুয়া হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু এটাকে স্বাধীনতা বলা যায় না, যদিও এও এক ধরণের প্রতীবাদ। একই সাথে জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচাও বটে। নারীর নিজেকে প্রমাণ করতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। পুরুষ দলপ্রধান এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন যেখানে মহুয়ার মৃত্যুকে বেছে নেয়া ছাড়া হয়তো উপায় ছিল না। কেননা, সমাজের চোখে সে মুক্ত নয় এমনকি মহুয়া নদের চাদকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েও রেহাই পায় নি। সেখানে মহুয়া নিজে মৃত্যুকে বেছে নিয়ে প্রেমের জন্য, নদের চাদের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। সমাজ পরিবর্তন করার সাধ্য যেহেতু তার নেই মৃত্যুকে বেছে নেয়ার ক্ষমতা তার আছে। সমাজ নারীদের কে এখনো সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র কিংবা ভোগের সামগ্রী মনে করে, সেখানে মহুয়া যতই আত্মনির্ভরশীল হোক না কেন। দলপ্রধানের সিদ্ধান্তের কাছে মহুয়ার গোষ্ঠীর জন্য সকল আত্মত্যাগ ম্লান হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের নারীবাদী দর্শন এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এ দেশের সমাজ সচেতন মানুষের সামনে মহুয়ার এই আত্মত্যাগ নানাবিধ প্রশ্নের জন্মদান করে। নারীবাদী দর্শনের আলোকে এই পরিবেশনা ব্যাখ্যার মাধ্যমেও তৎকালীন এবং বর্তমান পরিস্থিতি অনুধাবন করা গুরুত্বের দাবী রাখে।

প্রতিরূপায়ণ

বাস্তবকে উপস্থাপনার বিকল্পরূপ হচ্ছে প্রতিরূপায়ণ। বাস্তবের যে কোন কিছুর প্রতিরূপায়ণ করা যায় বাচিক ও সংকেতায়নের মাধ্যমে। প্রতিরূপায়ণ নিরপেক্ষ কিছু নয় এটা ব্যাখ্যামূলক, 'রাজনৈতিক' নয়, সর্বজনীনও নয়। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে এর ধারণা পরিবর্তিত হয়। মতাদর্শ, রাজনীতি, সাংস্কৃতিক ব্যবধান, চিহ্নের দ্যোতনা এবং ব্যাখ্যার বাহাস (discourse) বিচিত্র হওয়াতে এর রূপায়ণ বিচিত্র এবং একই সাথে বাচনিক ও দৃশ্যগত।

মিচেল প্রতিরূপায়ণ সম্পর্কে বলেন,

> জীবনের প্রতিরূপায়ণ হচ্ছে সাহিত্য সম্পর্কে সবচেয়ে সর্বসম্মত ও সাধারণ সচেতন জ্ঞান। প্রতিরূপায়ণ সাহিত্য বোঝার জন্য কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। কারও কারও মতে

এটা সাহিত্যের চূড়ান্ত রূপ দান করে। এরিস্টটল কলাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন, বচন, দৃশ্য এবং সংগীতময়তা হল প্রতিরূপায়ণ এর একটা কর্মপদ্ধতি। প্রতিরূপায়ণে দুটি পদ্ধতি Stand for (পক্ষে দাঁড়ানো) এবং act for (পক্ষে কথা বলা) । প্রতিরূপায়ণ দর্শকের কাছে যেভাবে পৌঁছায়,

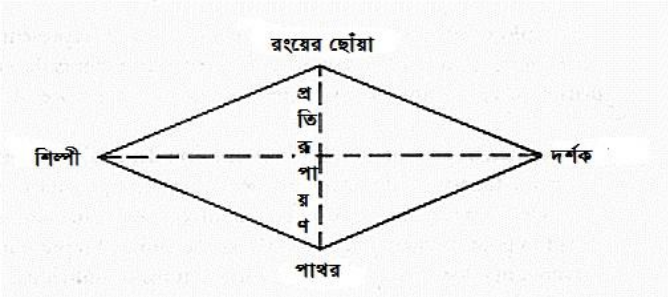

নাট্যে এই দু'টি বিষয় একসাথে আসে যেখানে অভিনেতা Stand for (পক্ষে দাঁড়ায়) বা ছদ্মবেশ ধারণ করে গল্পের চরিত্রের হয়ে। (Mitchell, 1994)

মহুয়া নারী চরিত্র হিসেবে নাট্যের পরিণতিতে সমাজের দূর্বল নারীর প্রতিরূপায়ণ করে। মহুয়ার পরিণতি (act for) নিজের সিদ্ধান্তের পক্ষে উপস্থাপন হলেও তা প্রতিরূপায়িত হয়েছে (Standing for) পুরুষের পক্ষে। মৃত্যু বেছে নেয়া দূর্বলতার লক্ষণ কারণ বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ হয় মহুয়া যদিও উদীচী শিল্প গোষ্ঠী'র প্রযোজনার শেষাংশে মহুয়া ও নদের চাদের মিলন দৃশ্য সংযোজিত হয়ে পাণ্ডুলিপির নবতর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

নারীরা বিশেষকরে প্রাচ্যের নারীরা যে শুধুমাত্র অবহেলিত তা নয় তারা নিম্নবর্গের চেয়েও নিম্নবর্গ। নিম্নবর্গের ভাষা হয় ক্ষীণ সেখানে নারীর ভাষা উপেক্ষিত এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অস্ফুট।

স্পিভাক, গায়ত্রী চক্রবর্তী। (২০০৪)। বলেন,

নিম্নবর্গের কথা বোঝার জন্য 'নির্যাসবাদী' কৌশল ব্যবহার করা উচিৎ যাতে সেই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। নিম্নবর্গ কেবল অপজন নয়, নিম্নবর্গ কেবল শোষিত নয়। নিম্নবর্গ কেবল লুটের ভাগ পায়নি তেমন বঞ্চিত তা নয়, তারা কেবল দলিত নয়। সেই হচ্ছে নিম্নবর্গ যার সীমিত সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদে প্রবেশের অধিকার নেই। নিম্নবর্গ হচ্ছে সে, যে সব সময় গমনের পথে আছে এক ক্ষেত্র থেকে অন্যক্ষেত্রে। তিনি আরো বলেন, অপজনকে প্রকাশের আয়তন দেয়া যেন দূরে ঠেলে না। স্পিভাক নারীকেই নিম্নবর্গ বলে মনে করেন।

স্পিভাক কর্তার প্রতিরূপায়ণ সম্বন্ধে বলেন, আমি কে? আমি আদৌ কি কথা বলতে পারি? এই 'আমি' স্পিভাকের কাছে সমগ্র নারী সমাজের উপস্থাপন।

নিম্নবর্গ নিজে কোন শ্রেণি তৈরি করতে পারে না কারণ তারা বুর্জোয়া ব্যবস্থার সাথে যুক্ত না। তখন তাদের দরকার পড়ে পথপ্রদর্শক। কেননা, তারা কথা বলতে পারে না। তাদের প্রতিনিধিত্ব দরকার হয়। স্পিভাক পিয়া মাশ- রে মতকে সমর্থন করেন। মাশ- রে বলেন, আমরা সব সময় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি পাঠ্যে কি বলা হয়েছে, কিন্তু পাঠ্যে যা লিখছে না বা বলছে না তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, নিরবতার মধ্যে নতুন কিছু খুঁজে পেতে পারি। স্পিভাক মনে করেন, নারীই পারে নারীর নিরবতার ক্ষেত্রকে ব্যাখ্যা করতে। (স্পিভাক, পৃ: ৩ - ৫৯)।

মহুয়া যদিও অর্থনৈতিক উপার্জনের সাথে সরাসরি যুক্ত তথাপি সে তার আত্মপরিচয় তৈরিতে ব্যর্থ কিংবা তার নিরব ভাষার প্রকাশে অন্য কোনো নারীর সহায়তা লাভও ঘটে নি। মহুয়ার পাশে দাঁড়াবার বিপরীতে নাট্যের অন্য নারী চরিত্রসমূহ নিরব ভূমিকা পালন করে। পিতৃতন্ত্রের সুদীর্ঘ চর্চা এবং এর প্রভাবে নারীরা যেনো বশ্যতা স্বীকার এবং অপর নারীর প্রতি পুরুষের নিপীড়ন স্বাভাবিক আচরণ বলে মেনে নেয়াটাই ভবিতব্য মনে করে। এটাই যেনো নিয়তি।

কেট মিলেট আলোচনায় বলেন,

> পিতৃতন্ত্রের ভিত্তি পুরুষ প্রাধান্য। সমাজের সর্বস্তরে পুরুষ প্রভুত্ব করে রেখেছে এবং নারীকে অধঃস্তন ভূমিকা পালন করতে বাধ্য করেছে। পিতৃতন্ত্র এমন পরাক্রমশালী যে নারী সকল নির্যাতন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। সকল কিছু নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়ে প্রতিবাদ থেকে বিরত থেকেছে। নারীর এই মান্যতাকে আপাতঃ সম্মতি নিয়ে পুরুষ তার উপর নির্যাতন চালায়। নারীকে অনেক বেশি প্রশমিত হয়ে কাজ করতে হয়, নারী কোনো কোনো ক্ষেত্রে যৌনতার মধ্য দিয়ে পরিপোষণ ও পদমর্যাদা বাড়াতে আবার কোনো ক্ষেত্রে ক্ষমতাশীল পুরুষকে ধরে টিকে থাকতে চেষ্টা করে। এগুলো মনস্তাত্ত্বিক স্তরে কাজ করে। পুরুষ প্রাধান্য মানেই পিতৃতন্ত্র, কাজেই পিতৃতন্ত্র নির্মূল না করলে পুরুষ প্রাধান্য নির্মূল হবে না এবং নারী মুক্তি আসবে না। অপরপক্ষে, পুরুষ প্রাধান্য নির্মূল করতে হলে জেন্ডার ব্যবস্থা নির্মূল করতে হবে। যৌন অবস্থান, ভূমিকা, পুরুষের মেজাজ প্রাধান্য তথা পুরুষসুলভ ভূমিকা এবং নারীর অধঃস্তন তথা নারীসূলভ ভূমিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক পার্থক্যগুলোকে অতিরঞ্জিত করে। পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ এমন শক্তিশালী যে পুরুষ নারীর আপাতঃ সম্মতি নিয়েই যেন নারীর উপর নির্যাতন চালায়। সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান বস্তুত জ্ঞানের সকল শাখায় নারীর পুরুষ অধীনতাও জোরদার করে, যার ফলে নারী নিজ হীনতাকে আত্মস্থ করে ফেলে, প্রতিবাদ করে না। (ইসলাম, ২০০৯)।

পুর্ববর্তী নারী সম্পর্কিত আলোচনায় নারী- পুরুষ পৃথক ধারণায় ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হলেও জুডিথ বাটলার ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। জুডিথ বাটলার নারী- পুরুষ প্রতিপক্ষ বলে প্রকাশে একমত নয়। তার মতে,

> জেন্ডার অভিকরণশীল। জেন্ডার এমন এক অদৃঢ় পরিচয় যা ক্রিয়ার বিশেষরীতির অনুবর্তীমূলক ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। জেন্ডার পূর্বনির্মিত এবং স্থিরকৃত নয়। শরীর বিশেষরীতির অনুবর্তীকরণের মাধ্যমে জেন্ডার নির্মাণ করে। নারী ও পুরুষ চরিত্রসমূহে জেন্ডারের ধারণা এমনভাবে কাজ করে যা নির্যাসবাদী অর্থে নারী- পুরুষের ধারণাকে নির্মাণ করে। (Butler, 2011)।

সমাজ যেভাবে পুরুষালি ও নারীসুলভ আচরণ দ্বারা নারী- পুরুষ পার্থক্যকরণ করেছে তার প্রকাশ দেখতে পাই *মহুয়া* প্রযোজনায়। নাটকে চরিত্রায়ণ ও অভিনয়ের মধ্যে জেন্ডার অভিকরণশীলতা পরিলক্ষিত হয়। নাট্যের প্রথম থেকেই মহুয়ার প্রতি যৌন আকর্ষণীয় শরীর কাঠমোর বিবরণ দিতে দেখা গিয়েছে, তাতে তাকে ভোগ্য বস্তু করে তোলা হয়েছে। নাট্য প্রযোজনাতেও মহুয়ার পোশাক, রূপসজ্জা এবং চলনে এই অভিকরণশীলতার বহিঃপ্রকাশ অক্ষুণ্ন রাখতে দেখা যায়। শুধু নাট্যে নয়, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী- পুরুষের এই অভিকরণশীলতা আত্মপরিচয় প্রকাশক বলা যেতেই পারে।

অনুকল্প

মূলত "ময়মনসিংহ গীতিকা'র *মহুয়া* নাট্য প্রযোজনায় নারীর প্রতিরূপায়ণ" শিরোনামের গবেষণা ক্ষেত্র ময়মনসিংহ শহরকেন্দ্রিক প্রযোজনা। এই গবেষণার প্রেক্ষাপটে মহুয়া পালার পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় উক্ত পাণ্ডুলিপিতে নারী চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রতুল, তথাপি গবেষণা করে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। এই গবেষণার অনুকল্প হলো "ময়মনসিংহ গীতিকা'র *মহুয়া* নাট্য প্রযোজনায় নারীর প্রতিরূপায়ণে নারীর বর্তমান পরিস্থিতি পালা রচনাকালের তুলনায় কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি লাভে ব্যর্থ হয়েছে।" সাহিত্য পর্যালোচনা ও ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উক্ত গবেষণা ক্ষেত্রে নির্বাচিত পালার চরিত্রের চারিত্রিক গুণাবলি বিচার- বিশ্লেষণ, পালার প্রেক্ষাপট এবং প্রযোজনার প্রায়োগিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুকল্পের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে।

কালক্রমে সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে নারী-পুরুষ ধারণারও পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে পরিবেশনা দর্শনেরও। একটি পরিবেশনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা সম্ভব। নাট্যসাহিত্য যেমন সমসাময়িক সামাজিক অবস্থাকে বয়ে নিয়ে আসে, ঠিক তেমনি নাট্য প্রযোজনা মঞ্চায়নের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা লাভ করা যেতে পারে। মানুষের তথা সমাজের প্রত্যেক চলনই সাংকেতিক। একটি পরিবেশনাও অসংখ্য সাংকেতিক বহিঃপ্রকাশের সমন্বয়। এই সংকেতের দিকে যথার্থ পর্যবেক্ষণ এবং কার্যকর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে অনায়াসে প্রতিটি ক্রিয়ার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করা যেতে পারে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের একটি পরিবেশনা তার সাহিত্যগুণের মাধ্যমে সাহিত্য সৃজন সময়ের সংকেত নির্দেশ করে, তেমনি বর্তমানের চর্চা নির্দেশ করে সমসাময়িক সংকেত। গবেষণার মাধ্যমে কার্যকর ব্যাখ্যা হাতিয়ার করে জ্ঞান সৃজন করা সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি

Judith, Butler. (2011). Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/performativity (access date 5 march 2013)

Schechner, Richard. (2020). *Performance Studies An introduction.* (4th Edition). London and New York: Routledge. P: 156

Spivak, Gayatri. chakraborty. (2004). *Can The Subltern speak*. Histoty Workshop journal. 58(58),3-59. Retrieved from muse.jhu.edu/journal/history_workshop_journal/summary/v058/58.1barrett.html.

উইকিপিডিয়া। (অনুল্লেখিত)। *নারীবাদী তত্ত্ব*। সংগৃহীত: ২৪ ডিসেম্বর ২০২১। গুগোল:https://bn.wikipedia.org/wiki/নারীবাদী_তত্ত্ব

কামাল, সুলতানা। (২০১০)। *নারী, মানবাধিকার ও রাজনীতি*। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

খানম, রাশিদা আখতার। (২০০৭)। *সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর*। সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ, মাসুদুজ্জামান (সম্পাদনা)। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, । পৃ: ২৫৩

বোভেয়ার, সিমোন দ্যা । (২০০১) *দ্বিতীয় লিঙ্গ*, হুমায়ুন আজাদ (অনুবাদ), ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, পৃ: ১০৪

মাসুদুজ্জামান। (২০০৭) নারী: যৌনতার রাজনীতি সাহিত্যের রাজনীতি। সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর। সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ , মাসুদুজ্জামান সম্পাদনা। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

সময় টিভি নিউজ। (২৮ জুন ২০২১)। *দেশে পুরুষ ও নারীর অনুপাত প্রায় সমান: বিবিএস*। সংগৃহীত ১২ অক্টোবর ২০২১। গুগোল: https://www.somoynews.tv/news/2021-06-28/দেশে- পুরুষ- ও- নারীর- অনুপাত- প্রায়- সমান

সরকার, চির রঞ্জন। (২০১০)। *নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন চ্যালেঞ্জ ও করণীয়*। ঢাকা: বাংলাপ্রকাশ, পৃ: ১৮

হাসান, অনুপম। (২০১৬)। *সাহিত্যনির্ভর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারীর অবস্থান*। ঢাকা: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ময়মনসিংহ গীতিকার অভিজ্ঞান : মহুয়া

দীনেশচন্দ্র সেন ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রাচীন পালাগানের সংকলন ময়মনসিংহ গীতিকা প্রকাশ করেন। পালাগুলোর রচয়িতা ভিন্ন হলেও সংগ্রাহক একজনই—চন্দ্রকুমার দে। ময়মনসিংহ গীতিকার বেশিরভাগ পালাই মূখ্যনারী চরিত্রের নাম অনুসারে। আর পালার নারী চরিত্র আবহমান বাঙালি ঐতিহ্যেরও উজ্জ্বল প্রতিনিধি।

ময়মনসিংহ গীতিকার প্রথম খণ্ডের মধ্যে অন্যতম পালা *মহুয়া*। এই পালার প্রধান নারী চরিত্র মহুয়ার নাম অনুসারে পালার নামকরণ করা হয়। পালার রচনাকাল ধরা হয় ১৬৫০ সাল। *মহুয়া* পালায় মোট ৭৮৯টি ছত্র আছে। দীনেশচন্দ্র সেন এই পালাগানকে ২৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। পালাটি ছন্দাকারে লেখা। রসের দিক থেকে *মহুয়া* পালা শৃঙ্গার ও করুণ রসের বাহক।

ময়মনসিংহ গীতিকায় যে গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্রগুলো দেখা যায়, *মহুয়া* পালার মহুয়া চরিত্রটি তাদের মধ্যে অন্যতম। একদিকে ছয় মাস বয়সে চুরি হয়ে যাওয়া ও বেদে–সর্দার হুমরার কাছে প্রতিপালিত হওয়া অনিন্দ্যসুন্দরী মহুয়া এবং অন্যদিকে রাজাপুত্র নদের চাদের অদম্য প্রেমকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এ পালার কাহিনি; যেখানে সমস্ত রোমান্টিকতার উপরে মৃত্যুই ছিল পরিণতি। দীনেশচন্দ্র সেন মৈমনসিংহ (ময়মনসিংহ) গীতিকার প্রথম খণ্ড–এর ভূমিকায় লিখেছেন, "মহুয়ার প্রেম কী নির্ভীক, কী আনন্দপূর্ণ! শ্রাবণের শতধারার ন্যায় দুঃখ আসিতেছে, কিন্তু এই প্রেমের মুক্তাহার কণ্ঠে পরিয়া মহুয়া চিরবিজয়ী, মৃত্যুকে বরণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছে"। (সপ্তসিন্ধু, ২০১৯)

ময়মনসিংহ অঞ্চলে *মহুয়া* দৃশ্যকাব্যটি মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপস্থাপনরীতি পরিলক্ষিত হয় যদিও পালা হিসেবেই এর গ্রহণযোগ্যতা বেশি। পালা এবং অন্যান্য উপস্থাপন রীতির ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুগত অর্থের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

স্বাধীনতা- উত্তর বাংলাদেশে নাট্যচর্চার সূচনা হলেও ১৯৭২ সালে গ্রুপ থিয়েটার কেন্দ্রিক নাট্যচর্চা, ১৯৮৭ সালের গ্রাম থিয়েটার আন্দোলন ও পরবর্তিতে উক্ত দশকেই প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নাট্যচর্চা সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়েছে, যার মাধ্যমে শহর আর মফস্বলের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ- মধ্যবিত্ত শ্রেণি নাট্যপ্রেমিকদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণার যোগসূত্র তৈরি হয়; ফলে পরিবেশনায় নতুন তত্ত্বের মেলবন্ধনে নাট্যচর্চা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। সমকালীন লোকনাট্য দর্শকের সামনে যৌক্তিকভাবে প্রদর্শন জন্য অনেকগুলো বিষয় খুব সচেতনভাবে বিবেচনা করতে হয়। যার মধ্যে লোকনাট্যের বহমান হাজার বছরের পরিবেশনার ধারায় মৌলিক উপাদান- গীত, বাদ্য, নৃত্যের পাশাপাশি পাণ্ডুলিপির নবতর সংযোজন বহুমাত্রীক দর্শন ভাবনার সাথে মঞ্চ পরিকল্পনা, আলোক পরিকল্পনা, পোশাক পরিকল্পনা, রূপসজ্জা, এবং আবহ সংগীতের মাধ্যমে নাটকের আধুনিক ভাষা তৈরির চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এই প্রতিটি

উপাদানই নাট্যে কার্যকর ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপনে আধুনিক ভাবদর্শন প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, একটি পালানাট্য দর্শক চিত্তে জীবন্ত করে তোলার জন্য বহুমাত্রিক ধ্যান- ধারণা; নির্দেশক ও অভিনেতা সর্বোপরি কলাকুশলীরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। যার ফলে পরিবেশিত নাটকটি শহরকেন্দ্রিক বিশেষ শ্রেণির দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা তৈরিতে সমর্থ হয়। সমসাময়িক শহরকেন্দ্রিক নিদের্শনায় প্রচলিত ধ্রুপদী কাঠামোতে বিচারবিশ্লেষণ না করে ঐতিহ্যবাহি ময়মনসিংহ গীতিকার যে আখ্যানধর্মী নান্দনিক বয়ান উপস্থাপন করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। কিভাবে নাট্যশিল্পী ঔপনিবেশিক শিল্পমতবাদের সাথে ঐহিত্যবাহি বাংলানাট্যের নিজস্ব নন্দনভাবনার আলোকে বিচার- বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলানাট্যের অদ্বৈত শিল্প সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছেন তার যথার্থতা অনুধাবিত হয়। জেনে রাখা দরকার ময়মনসিংহ গীতিকার পরিবেশনরীতির আদ্যোপান্ত। সমকালীন ময়মনসিংহ গীতিকার বেশ কয়েক ধরণের পরিবেশনরীতি লক্ষ্যকরা যায় যেমন

১. গুরুশিষ্য পরম্পরা পরিবেশনরীতি

২. গ্রুপ থিয়েটারকেন্দ্রিক পরিবেশনরীতি

৩. গ্রাম থিয়েটারকেন্দ্রিক পরিবেশনরীতি

৪. বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক পরিবেশনরীতি।

বলাবাহুল্য গুরুশিষ্য পরম্পরা পরিবেশনরীতির তুলনায় অন্যসব রীতিতে ঔপনিবেশিক নন্দনভাবনা অভিযোজিত। তবে এও বলে রাখা দরকার গুরুশিষ্য পরম্পরা পরিবেশনরীতিতেও সমসাময়িক অথবা পূর্বে পরিবেশিত ঐতিহ্যবাহি বাংলা বহুল সুর ও লৌকিক নন্দন ভাবনায় প্রভাব লক্ষ্যকরা গেলেও সেক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক অভিযোজন অনস্বীকার্য। বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে ময়মনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা তৈরি করা প্রয়োজন। ময়মনসিংহ গীতিকা বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রাচীন পালাগানের সংকলন গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন বৃহত্তর ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে'র সংগ্রহে ও সার্বিক সহায়তায় সম্পাদনা করে ময়মনসিংহ (মৈমনসিংহ গীতিকা (১৯২৩) প্রকাশ করেন। এই প্রকাশিত গীতিকায় স্থান পেয়েছে মোট ১০টি পালা।

১.মহুয়া

ময়মনসিংহ গীতিকার প্রথম পালা দ্বিজ কানাই প্রণীত *মহুয়া* পালা। পালার কাহিনি গঠিত হয়েছে মহুয়া, নদের চাদ, মানিক, সাধু- সন্ন্যাসীসহ অন্যান্য চরিত্রগুলোর

উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে। এর রচনাকাল ধরা হয় ১৬৫০ সাল। পালায় মোট ৭৮৯টি ছত্র আছে। দীনেশচন্দ্র সেন *মহুয়া* পালাকে ২৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেন।

২.মলুয়া

গবেষকদের ধারণা *মলুয়া পালাটি* বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতির প্রণীত, কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন ময়মনসিংহ গীতিকার প্রথম খণ্ডে এই ধারণা অসত্য বলে মন্তব্য করেন। এ পালার প্রধানতম চরিত্র চাদ বিনোদ, হীরাধর, কাজী, মলুয়া চরিত্রের সমন্বয়ে বিজয়ী প্রেমের কাহিনি সূচিত হয়েছে। বাংলার পুরনারী নামের বইয়ে *মলুয়া* চন্দ্রাবতীর রচনা বলে মন্তব্য করেন। *মলুয়া* গাঁথার মোট ছত্রসংখ্যা ১২৪৭। পালাটি মোট ১৯টি অঙ্কে বিভক্ত।

৩.কমলা

কমলা পালাটির রচয়িকা দ্বিজ ঈশান। পালার চরিত্ররূপে সুধন, কমলা, কারবুল প্রদীপ কুমারসহ চিকন গোয়ালীকে দেখা যায়। কাহিনি বিশ্লেষণ করলে অকুতোভয় জীবন সংগ্রামের সরল কাহিনির বর্ণনা পাই। *কমলা* পালাটি মোট ১৩২০টি ছত্র এবং ১৭টি অঙ্কে বিভক্ত।

৪.দস্যু কেনারাম

দস্যু কেনারাম পালার লেখক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি মহিলা কবি চন্দ্রাবতী। নাটকের অন্যতম চরিত্র খেলারাম, যশোধরা ও কেনারাম। খেলারাম ও যশোধরা এর পুত্র কেনারাম যার জীবনের বিচিত্র ঘটনা উক্ত পালার প্রাণবস্তু।

৫.চন্দ্রাবতী

চন্দ্র ও জয়ানন্দের প্রেমের কাহিনি নির্ভর এ পালার রচয়িকা নয়াচাদ ঘোষ। যার অন্যতম চরিত্র চন্দ্রাবতী, জয়চন্দ্র, বংশীদাস প্রমূখ।

৬.রূপবতী

রূপবতী পালার পালাকার সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা পাওয়া না গেলেও; পালাটি ময়মনসিংহ গীতিকার অন্যতম বিশেষস্থান দখল করে আছে। পালার অন্যতম চরিত্র রাজা, রাণী, রাজকন্যা প্রমূখ। উক্ত পালায় বাঙালির শতবছরের জীবনচিত্র উঠে এসেছে।

৭.কাজলরেখা

ময়মনসিংহ গীতিকার এ পালার পালাকার সম্পর্কে সঠিক কোন ধারনা পাওয়া যায় না। কাজলরেখা, সূচরাজপুত্র, রাজা ও কঙ্কনদাসী এ পালার মূখ্যচরিত্র। সরল কাহিনির এ পালার সংক্ষিপ্তরূপ সংকলিত হয়েছে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলিতে।

৮.কঙ্ক ও লীলা

গবেষকদের তথ্যানুযায়ী *কঙ্ক ও লীলা* পালার পালাকার হিসেবে রঘুসুত, দামোদর, শ্রীনাথ, নয়ান চাদ ঘোষ এই চারজনের নাম পাওয়া যায় । করুণ রসে সিক্ত পালাটির কাহিনিতে প্রধানতম চরিত্র লীলার মৃত্যুর মধ্যেদিয়ে *কঙ্ক ও লীলা* পালার সমাপ্তি ঘটে।

৯.দেওয়ান ভাবনা পালা

ময়মনসিংহ গীতিকার *দেওয়ান ভাবনার* পালার পালাকার সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না। পালার চরিত্রের মাঝে সোনাই, মাধব, দেওয়ান ভাবনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য ময়মনসিংহ গীতিকা শুধুমাত্র এই পালার নামকরণের ক্ষেত্রে প্রধান পাত্র- পাত্রীর পরিবর্তে খল চরিত্র দেওয়ান ভাবনার নামানুসারে করা হয়েছে।

১০. দেওয়ান মদিনা

মনসুর বয়াতি রচিত *দেওয়ান মদিনা* পালা। মূল ঘটনা মদিনার স্বামীর প্রতি প্রেম। রসের দিক থেকে করুণ রসের কাব্য *দেওয়ান মদিনা* পালার সংগ্রাহক দীনেশচন্দ্র সেন। এই পালাটি *আলাল- দুলালের* পালা নামেও পরিচিত। এর চরিত্রগুলো হলো- মদিনা, আলাল, দুলাল প্রমূখ।

গীতিকার কাহিনি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রতিটি পালার বিষয়বস্তু লোকসমাজের নানারকম অভিজ্ঞতার ফসল। ঐতিহ্যবাহি বাংলা নাট্যের অন্যান্য ধারার ন্যায় এই ধারার মূল উপজিব্য ধর্ম নয়, পার্থিব জীবনকথাই প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে প্রতীয়মান।

ময়মনসিংহ গীতিকার *দস্যু কেনারামের* পালা ছাড়া বাকি ৯টি পালার মূখ্য বিষয় নর-নারীর লৌকিক প্রেম। প্রেমের পরিণতি কোনোটি মিলনাত্মক, কোনোটি বিয়োগান্তক। প্রধান নারী চরিত্রের নামানুসারে গীতিকাগুলির নামকরণ হয়েছে। গীতিকাগুলিতে পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রের ভূমিকা উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। প্রেমের প্রতিষ্ঠায় তারাই বেশি সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছে। নারীদের একনিষ্ঠ প্রেম ও বলিষ্ঠ চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে মনে করেন, গীতিকাগুলিতে কোনো মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব থাকতে পারে। নারী চরিত্রের মহিমা কীর্তন করে দীনেশচন্দ্র সেন গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, "এই গীতিকাগুলির নারী চরিত্রসমূহ প্রেমে দুর্জয় শক্তি, আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে। নারীপ্রকৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড় হয় নাই—চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে"। (উইকিপিডিয়া) । রচয়িতাদের আবির্ভাবকাল, কাব্যের জীবনকথা, আর্থ- সামাজিক পটভূমি, ভাষাদর্শ ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে গীতিকাগুলি মধ্যযুগে রচিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। বলা বাহুল্য গীতিকাগুলো আর্থ- সামাজিক রাজনৈতিক ভাষাশৈলি, রাজ- রাজা, জমিদারি, চরিত্রের রূপকতা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় গীতকাগুলো রচিত হয়েছে মধ্যযুগে। যার বিষয়বস্তু মানবপ্রেম। গানগুলিতে ঈশ্বরপ্রেমের কোন প্রাধান্য নেই তবে বন্দনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর বন্দনা করা হয়। গীতিকা প্রসঙ্গে প্রসংঙ্গত বলে রাখা দরকার,

> মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত ও সমাদৃত হওয়ার পরে দীনেশচন্দ্র সেন ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আরও অনেক গীতিকা সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১৯২৬) নামে মোট তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। স্থানীয় গ্রামের মানুষ এগুলিকে 'পালাগান' নামে অভিহিত করে থাকে। দীনেশচন্দ্র সেন ইংরেজি ballad- এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'গীতিকা' শব্দটি গ্রহণ করেন। বাংলা গীতিকা বর্ণনামূলক গীতি-আলেখ্য; তবে এতে প্রচুর নাটকীয় ঘটনার এবং চরিত্রের উক্তি- প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপেরও স্থান আছে। একজন গায়েন আনুপূর্বিক ঘটনার বিবরণ ও চরিত্রের উক্তি- প্রত্যুক্তি গান করে পরিবেশন করেন। দোহাররা ধুয়া গেয়ে এবং বাজনদাররা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তাকে সাহায্য করে। প্রধানত গ্রামের মানুষ এর দর্শক- শ্রোতা; তারা আসরে বসে মুগ্ধচিত্তে গীতিকার গীতিরস ও নাট্যরস উপভোগ করে। (উইকিপিডিয়া)

মহুয়ার পরিচয়

ময়মনসিংহ গীতিকার সর্বাধিক জনপ্রিয় পালা *মহুয়া*, যা বাংলার লোকগীতি বা গীতিকার ইতিহাস প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সম্পদের মধ্যে অন্যতম সম্পদ। গীতিকার এই পালা সম্পর্কে সম্পাদক শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন মৈমনসিংহ গীতিকার ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেন। ময়মনসিংহ গীতিকা ১৯২১ সালের ৯ মার্চ তিনি চন্দ্রকুমার দে- এর নিকট থেকে পালাটি সংগ্রহ করেন। তিনি সংগৃহীত পালা সম্পর্কে উল্লেখ করেন,

> চন্দ্রকুমার দে যেভাবে গীতিকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক অসংঙ্গতি ছিলো, গোঁড়ার গান শেষে আর শেষের গান গোঁড়ায় এইভাবে গীতিকাটি উল্টা- পাল্টা ছিলো, আমি যথাসাধ্য এই কবিতাগুলি পুনঃপুনঃ পড়িয়া পাঠ ঠিক করিয়াছি (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮২)।

এজন্য নমশূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বিজ কানাই নামক কবি প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে পালাটি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। প্রবাদ আছে যে, দ্বিজ কানাই ছিলেন সমাজের অতিহীনকুল- জাতির পুরুষ। তিনি এক সুন্দরীর প্রেমে মত্ত হয়ে বহু কষ্ট সহিয়া ছিলেন। এজন্যই নদের চাদ ও মহুয়ার হৃদয়ের এক মহাশক্তিরূপে প্রকাশ পেয়েছে তার লেখনীতে।

> নদের চাদ ও মহুয়ার গান একসময়ে পূর্ব- মৈমনসিংহের ঘরে ঘরে গীত ও অভিনীত হইত। কিন্তু উত্তরকালে ব্রাহ্মণ্য- ধর্ম্মের কঠোর শাসনে এই গীতিবাণিত প্রেম দুর্নীতি বলিয়া প্রচারিত হয় এবং হিন্দুরা এই গানের উৎসাহ দিতে বিরত হন। এখন বহুকষ্টে এই গীতিকাটির সমগ্র অংশ উদ্ধার করা হইয়াছে। গীতিকার প্রথম ১৬ ছত্রের স্তোত্র জনৈক মুসলমান গায়কের রচিত। গীতি- বাণিত ঘটনার স্থান নেত্রকোণার নিকটবর্তী। খালিয়াজুরি থানার নিকট- রহমৎপুর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে "তলার হাওড়" নামক বিস্তীর্ণ হাওড়। ইহারই পূর্বে বামনকান্দি, বাইদার দীঘি, ঠাকুর বাড়ির ভিটা, উলুয়াকান্দি, প্রভৃতি স্থান এখন জনমানবশূন্য হইয়া রাজকুমার ও মহুয়ার সম্মতি বহন করিতেছে। ...যে কাঞ্চনপুর হইতে 'হোমরা' বেদে মহুয়াকে চুরি করিয়া লইয়া যায়- তাহা ধনু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। নেত্রকোনার অন্তর্গত সান্দিকোনা পোষ্ট অফিসের অধীন মস্কা ও গোরালী নামক দুইটি গ্রাম আছে। মস্কা গ্রামের সেক আসক আলী, উমেশচন্দ্র দে এবং গোরালীর নসুসেকের নিকট হইতে এই গানের অনেকাংশ সংগৃহীত হয়। (সেন, ১৯৩২)

গীতিকার সম্পাদক আরো বলেন-

> ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ আমি চন্দ্রকুমারের নিকট হইতে এই গাঁথা পাইয়াছি। চন্দ্রকুমার দে যেভাবে গীতটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক অসঙ্গতি ছিল, গোঁড়ার গান শেষে আর শেষের গান গোঁড়ায়। এইভাবে গীতিকাটি উলট- পালট ছিল। আমি যথাসাধ্য এই কবিতাগুলি পুনঃপুনঃ পড়িয়া পাঠ ঠিক করিয়া লইয়াছি। এই গানের মোট ৭৫৫ জন ছাত্র পাওয়া গিয়াছে, আমি তাহা ২৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি। মহুয়ার গান পড়িয়া

> আমাদের ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড রোনাল্ডসে বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। (সেন, ১৯৩২)

পালাগানটিতে কাহিনি বর্ণনায় সঙ্গত রচনারীতির ঘাটতি ও নানা অতিশয়োক্তি রয়েছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপভাষায় রচিত ও নাটকীয় গুণসম্পন্ন এ পালাটিতে বর্ণনারীতির প্রাধান্য রয়েছে। এ অঞ্চলের তৎকালীন সমাজ- বাস্তবতাসহ পালাটি দুর্জয় প্রেমের অপূর্ব নিদর্শন। (উইকিপিডিয়া)

ময়মনসিংহ শহরে *মহুয়া* পালা পরিবেশনার ইতিহাস (সাক্ষাৎকার ভিত্তিক বিবরণ)

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে ময়মনসিংহ গীতিকার চর্চার ইতিহাস প্রায় ৪০০ বছরের। তবে কালের পরিক্রমায় বৈচিত্রমূখী নন্দন ভাবনার সাথে যোগসূত্রের ফলে বিংশ শতাব্দির ৩০ এর দশকে কালো কালির অক্ষরে গ্রন্থবদ্ধ হলে তা গুরুশিষ্য পরম্পরা চর্চা থেকে সৃজনশীল কর্মী দ্বারা চর্চীত হতে শুরু করে। তবে এর ঐতিহাসিক কোন গ্রন্থ আমাদের হাতে পৌঁছায় নি। বলা বাহুল্য সমসাময়িক ময়মনসিংহ অঞ্চলে বেশ কয়েকজন প্রবীন শিল্পী ও সাধকরা এখনো বেঁচে আছে, যাদের বয়স ৬০ থেকে ৭০ হলেও শিল্প সাধনার বয়স প্রায় ৫০ থেকে ৬০ বছর। তাদের সাথে কথা বলে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার নানা তত্ত্ব ব্যবহার করে ময়মনসিংহ অঞ্চলের নগর মঞ্চায়নের ৫০ বছরের ইতিহাসের একটা পরিশিলীত রূপ উদ্ধার করতে পেরেছি। যা ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রবীনদের কাছে গ্রহনযোগ্যতার প্রেক্ষিতেই সারোয়ার জাহানের সাক্ষাৎকার উপস্থাপন করা যেতে পারে,

> আমি একটু বাড়িয়ে বলি, সেটা হচ্ছে যে ময়মনসিংহকে আমাদের অতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিচারে এই জেলাকে জাতীয়ভাবে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে। শিল্প- সংস্কৃতির নগরী ময়মনসিংহ দ্যা সিটি অফ আর্ট এন্ড কালচার, অতীত ঐতিহ্যের যে পরিক্রমা এখানে লোকজ ঐতিহ্য মূলত মূখ্য বিষয় যদিও পাশাপাশি আরো অন্যান্য ঐতিহ্য আছে। তবে পরিবেশনামূলক ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করতে গেলে ময়মনসিংহ গীতিকার আখ্যানগুলোর যে নান্দনিকতা বা দর্শক সমাজ কর্তৃক সমাদৃত হওয়ার যে বিষয়টি এগুলিকে ম্লান করে দিয়েছে যে পালাটা সেটার নামই হচ্ছে *মহুয়া* । আমি যদি ভুল না করি এটার সূত্রপাতটা হয়েছে ১৯৭৩ অথবা ১৯৭৪ সালে। আমাদের বঙ্গবন্ধু পরিবারের শেখ ফজলুল হক মনি তখন ময়মনসিংহের প্রতি, ময়মনসিংহের সংস্কৃতির প্রতি খুব নিবেদিত ছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পল্টন ময়দানে ময়মনসিংহের লোকজ ঐতিহ্যের উপরে প্রোগ্রাম করার চিন্তার সূত্রে ময়মনসিংহ শহরের বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা সংস্কৃতিজন, তার মাঝে প্রয়াত স্নেহাশীষ চৌধুরী আছেন যিনি এই লোকজ ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জেলা শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক সম্মাননা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আছেন অধ্যাপক সুধীর দাস, প্রয়াত নৃত্যগুরু পীযূষ কিরণ পাল, দেশ নন্দিত লোকনৃত্য গুরু প্রয়াত ওস্তাদ ইউনুস আহমেদ বাবলু, এমনিতর অনেক

মানুষের সাথে তার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকার কারণে তিনি ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে *মহুয়া*'টা গীতিনৃত্যনাট্য করার পরিকল্পনা করেন। আগে কিন্তু ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে যারা বিভিন্ন পালাকার ছিলো বা লোক আঙ্গিকের গান করত তারা মহুয়াকে উপস্থাপন করত কিচ্ছা হিসেবে। তখন এটা কোন গীতিনৃত্যনাট্যরূপ ছিল না। কিচ্ছা রূপে প্রচলিত এই মহুয়াটাকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আব্দুর রাজ্জাক প্রথম গীতিনৃত্যনাট্য রূপে রূপ দিলেন এবং উনি এই রূপ দিতে গিয়ে যে ব্যক্তির কাছ থেকে একেবারে সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছেন এবং যার মেধা- মননের ফসল হিসেবে মহুয়া হয়েছে, এটা আমরা স্বীকার করি এখনও যে তিনি হলেন পরম শ্রদ্ধেয় গবেষক অধ্যাপক আবদুর রশিদ মিঞা। আমি কেন বললাম এই কথাটা যে আমরা ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া আখ্যানটাকে যেভাবে দেখি সেখানে যে আখ্যানগুলো আছে সেখানে হয়তো দুটো গান আছে বা বিশাল একটা কলেবরের একটা গান আছে। অধ্যাপক আবদুর রশিদ মিয়া ২/ ৪ লাইনে লেখা বিষয়টিকে উনি নিজের মত করে নতুন করে লিপিবদ্ধ করেন। একেবারে সেই রূপ রস ঠিক রেখে তিনি এটার সুর সংযোজনও করেন। সুধীর দাস শিল্পী গীতিকার, সুরকার এবং সংগীত পরিচালক ছিলেন। তিনি এই মহুয়া গীতিনৃত্যনাট্যতে একেবারে লাইভ কন্ঠ দিতেন। তিনি বাংলাদেশের একজন ব্যতিক্রমী কন্ঠের অধিকারী শিল্পী ছিলেন। সুধীর দাস ময়মনসিংহের শ্যামগঞ্জ উনার বাড়ি। ময়মনসিংহ মহাবিদ্যালয় অধ্যাপনা করতেন। উনার অ্যাপ্রোচটা মহুয়াকে একেবারেই জীবন্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে বিশাল একটা ব্যাপার ছিল। এমনকি আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে বয়াতির যে বয়ান এটা অনেক সময় দেখা গেছে যে উনি নিজের মতো করে স্থান- কাল- পাত্রভেদে রচনা করতেন। যেমন সে একটা জায়গায় গেল ওই জায়গাটার বন্দনা তিনি এখানে ঢুকায়ে দিল যার দ্বারা অপূর্ব একটা কিছু সৃষ্টি হতো। আর সেই মুহূর্তে নৃত্যের পরিচালক ছিল যোগেশ দাস। আর প্রথম যিনি মহুয়া করেছিল তাকে আমরা বলি নীলু দি। ওনার পুরো নাম নিলুফার রাজ্জাক। তিনিই প্রথম মহুয়ার নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন।... এই হল আমাদের মহুয়া প্রযোজনার প্রাইমারি স্ট্রাকচার। ঢাকাতে এই মহুয়া হওয়ার পরেই এটা এমনভাবে প্রশংসিত হয়। মজার ব্যাপারটা হল যে ঢাকা তারা দ্বিতীয়বারের মতো ওইখানে আবার মহুয়া করানোর জন্য ওইখান থেকে আমাদের ছাড়তেই চাইছিলো না। পরবর্তীতে আব্দুর রাজ্জাকের পরে এই মহুয়াটা ময়মনসিংহের বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠী নিজেরা প্রোডাকশন করে। তারমধ্যে প্রথমেই যে নামটা আছে সেটা হল উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী কিন্তু তারা যেটা করে সেটার গ্রন্থনা আব্দুর রাজ্জাকের ছিল না। আমাদের *মহুয়া*'র দৈর্ঘ্য ছিল দুই ঘন্টার উপরে কিন্তু পরে সময়ের দাবীতে সংক্ষেপ করতে বলা হলো এবং তখন জেলা শিল্পকলা একাডেমি ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং তৎকালীন সাবেক জেলা কালচারাল অফিসার ২০,০০০ টাকা এই মহুয়া অডিও রেকর্ডিং এর জন্য প্রদান করে। আমরা ময়মনসিংহে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথিতযশা তারা বিনা শ্রমে আমরা ঢাকায় পাঁচ দিন থেকে প্রায় ৪০ জন কলাকুশলী এটা রেকর্ড করি এবং ঠিক তখন এই মুহূর্তে গ্রন্থনা করার দায়ভার পরে আমার উপর অর্থাৎ সারোয়ার জাহান এর উপর। আমি যে মহুয়াটা গ্রন্থনা করলাম নতুন করে সেটার দৈর্ঘ্য ১ ঘন্টা ১৫ মিনিটের। পরবর্তীতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এই মহুয়াকে তাদের মত করে জাতীয়ভাবে আলাদা একটা রেকর্ড করে। যেখানে সংগীত তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রয়াত সংগীত পরিচালক আলী আজগর খোকন। (জাহান, ২০২১)

ময়মনসিংহ গীতিকার *মহুয়া* পালার কাহিনিতে পালাকার তৎকালিন সময়ের বিচিত্র চিত্র তুলে ধরেছেন তার শৈল্পিক বৈভবে। ফলে গীতিকার অন্যসব পালার চেয়ে উক্ত পালাটি শত বছরে ধরে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গুরুশিষ্য পরম্পরা শিল্প সাধকগন ও আসরের প্রাণ দর্শক তার রসাস্বাদন করে আসছে। বিংশ শতকের প্রারম্ভে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তিতে এ গীতিকা নিয়ে নানারকম গবেষণার ফলে তা মৌখিক অবস্থান থেকে গ্রন্থিকরূপ নেয়। এ গ্রন্থিকরূপের ফলস্বরূপ সৌখিন নাট্যদলগুলো পালা পরিবেশনে ব্রত হয়। কেউ নৃত্যনাট্য, কেউ গীতনাট্য আবার কেউ দেশজ নাট্যের প্রভাবে শহরকেন্দ্রিক পরিবেশনা করে থাকে। বলাবাহুল্য ময়মনসিংহ শহরের সৌখিন ও সৃজনশীল নাট্যকর্মিদের মধ্যে প্রবীন নাট্যকর্মী ও গবেষকগণ মনে করেন স্বাধীন বাংলাদেশে গীতিকা নিয়ে পরিবেশনা ধারায় ময়মনসিংহ শহর-ই প্রথম। তাদের পরিবেশনার সঙ্গী ছিলো *মহুয়া* পালা। পরবর্তিতে দেশের নানা স্থানে এ পরিবেশনা হতে দেখা যায়। বর্তমানে গীতিকা নিয়ে নানা রকম গবেষণার ফলস্বরূপ গ্রুপ থিয়েটারকেন্দ্রিক নাট্যচর্চা ও বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক (প্রাতিষ্ঠানিক, সৌখিন) নাট্যচর্চায় *মহুয়া* পরিবেশনা হতে দেখা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অসিত কুমার । (১৯৮২) *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লিমিটেড- কলকাতা, পৃ. ৫- ৭

উইকিপিডিয়া। (অনুল্লেখিত) *মৈমনসিংহ গীতিকা*। সংগৃহীতঃ ০১ জানুয়ারি, ২০২২। গুগোল: https://bn.wikipedia.org/wiki/মৈমনসিংহ_গীতিকা

সেন, শ্রীদীনেশচন্দ্র। (১৯৩২, নভেম্বর ২৪)। *পালাগুলির বিবরণ। মৈমনসিংহ গীতিকা (মহুয়া ও দেওয়ানা মদিনা ২০১১),* শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর সঙ্কলিত। সুচয়নী পাবলিশার্স, পৃ. ৩১- ৩২

জাহান, সারোয়ার। (২০২১, অক্টোবর ৩০) । গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

সপ্তসিন্ধু। (২০১৯) *পালাগানরে নায়কিারা*। অন্যআলো। সংগৃহীত: ১২ এপ্রিল ২০১৯। গুগোল: https://cutt.ly/7kw9IVm

তৃতীয় অধ্যায়

পাণ্ডুলিপিতে নারীতত্ত্ব অনুসন্ধান

সমকালীন ময়মনসিংহ গীতিকাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলেও গীতিকার কাহিনিগুলো বিনির্মাণ হয়েছে মূলত নারীর প্রেম- শক্তির জয়গান, সতীত্ব, নারীর ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। পালানাট্যের গঠনশৈলী অনুযায়ী পালাসমূহের প্রারম্ভে বন্দনাগীত পরিলক্ষিত হয়। *মহুয়া* পালাতেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। পালানাট্যটির পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এখানে নারী সম্বন্ধে তৎকালীন নারী দর্শনের খোঁজ করা প্রয়োজন বোধ করি।

বন্দনাগীতি

পূবেতে বন্দনা করলাম পূবের ভানুশ্বর।
এক দিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পশর ॥
দক্ষিণে বন্দনা গো করলাম ক্ষীর নদী সাগর।
যেখানে বানিজ্জি করে চান্দ সদাগর ॥
উত্তরে বন্দনা গো করলাম কৈলাস পরবত।
যেখানে পড়িয়া গো আছে আলীর মালামের পাথর
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন স্থান।
উদিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসলমান !
সভা কইরা বইছ ভাইরে ইন্দু মুসলমান।
সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম !
চাইর কুনা পিথিমি গো বইন্ধ্যা মন করলাম স্থির।
সুন্দরবন মুকামে বন্দলাম গাজী জিন্দাপীর
আসমানে জমিনে বন্দলাম চান্দে আর সুরুষ।
আলাম- কালাম বন্দুম কিতাব আর কুরান ॥
কিবা গান গাইবাম আমি বন্দনা করলাম ইতি
উস্তাদের চরণ বন্দলাম করিয়া মিনতি ॥ (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৪১)

ময়মনসিংহ গীতিকার (মৈমনসিংহ গীতিকা) বহুল পঠিত ও পরিবেশিত পালার মধ্যে অন্যতম *মহুয়া* পালা। এই পালার নামকরণের মধ্যে দিয়েই অনুধাবন করা যায় নাট্য আখ্যানের মধ্যে নারী চরিত্র মহুয়ার রূপরেখাই মূখ্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু পালার বন্দনাগীতিতে গাজী জিন্দা পীর, চান্দ সওদাগর, হযরত আলী'র উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও কোনো নারী দেবীর উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায় না। ভারতীয় ভাবদর্শনে চান্দ সওদাগরের এর চেয়ে মনসা দেবী এই পালার বন্দনা গীতিতে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়, কেননা ভারতীয় পুরাণ অনুসারে চান্দ সওদাগর শিব পুজারী সাধারণ একজন মানুষ, অপরদিকে মনসা দেবী ছিলেন লৌকিক দেবী। ঐতিহ্যবাহি লোকনাট্যের বিভিন্ন পালার বন্দনায় সরস্বতী দেবী উল্লেখ থাকলেও নারীকেন্দ্রিক *মহুয়া* পালায় কোন নারী দেবীর বন্দনা পরিলক্ষিত হয় না। এটি ভাবনায় উদ্বেগ ঘটায়।

বোধ করি উক্ত পালায় নারী দেবীর অনুল্লেখ থাকাটা পুরষতান্ত্রিক ভাবাদর্শের বহিঃপ্রকাশ প্রতীয়মান করে।

পুরষতন্ত্র নারীকে তার সৌন্দর্য্যের মাপকাঠিতে বিচার করে, নারী রূপে মোহিত হতে চায়। এমনকি ছয় মাসের নারী শিশু তার সৌন্দর্য্যের কারণেই জীবন রক্ষাপায় এবং একই সাথে ব্যবসায়িক পণ্যে রূপলাভ করে।

ছয় মাসের শিশু কইন্যা পরমা সুন্দরী।
রাত্রি নিশাকালে হুমরা তারে করল চুরি ॥
চুরি না কইর‍্যা হুমরা ছার‍্যা গেল দেশ।
কইবাম সে কন্যার কথা শুন সবিশেষ ॥ (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৪২)

পালার প্রধানতম চরিত্রের মধ্য অন্যতম হুমরা বাইদ্যা। বেদে সম্প্রদায়ের প্রধান হুমরা বাইদ্যার বর্তমানে বেদে পেশার পাশাপাশি তামশা খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করলেও এক সময় তিনি ডাকাতি করতেন। ডাকাতির পাশাপাশি তিনি বেদে সম্প্রদায়ে জাতিগত পেশার সাথেও জড়িত ছিলেন। উল্লেখিত অংশে দেখা যায় হুমরা ষোল বছর আগে ডাকাতি করতে গিয়ে ছয় মাসের শিশু কন্যাকে চুরি করে নিয়ে আসে। পালায় ছোট্ট শিশুর যে রূপ বর্ণনা অনুযায়ী ''ছয় মাসের শিশু কন্যা পরমা সুন্দরী'। অর্থাৎ হুমরার ছোট্ট শিশুর চুরির পেছনের উদ্দেশ্য হতে পারে শিশুটির রূপ সৌন্দর্য্যেকে কাজে লাগিয়ে ভবিষৎ- এ ব্যবসায়িক উন্নয়ন সাধন করা।

ছয় মাসের শিশু কন্যা বচ্ছরের হৈল।
পিঞ্জরে রাখিয়া পঙ্খি পালিতে লাগিল ॥
এক দুই তিন করি শুল বছর যায়।
খেলা কছরত তারে যতনে শিখায় ॥ (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৪২)

"কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, বরং নারী হয়ে ওঠে।" (বোভোয়ার, ২০০৮) উক্ত পয়ারের প্রেক্ষিতে মহুয়াকে গড়ে তোলার যে প্রক্রিয়া বর্নিত হয়েছে তাতে উল্লেখ আছে মহুয়াকে হুমরা বেদে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত যতন (যত্ন) করে নানা রকম কছরত (কসরত) শিখিয়েছেন। হুমরা নিজের হাতে মহুয়াকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে দক্ষ করে গড়ে তুলেছেন। তাকে একা বাড়ির বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা, দলের অন্য সদস্যদের সাথে মিলেমিশে থাকার, সাপ তথা ভয়ানক বিষয় ও বস্তুর সাথে বন্ধুত্ব প্রভৃতি করতে শেখাচ্ছে। অথচ মহুয়া যখন নিজের পছন্দের ছেলের সাথে প্রেম- প্রণয়ে আবন্ধ হয়েছে ঠিক কখন হুমরা তাতে অসম্মতি পোসন করছে। শারীরিক ভাবে মহুয়াকে খেলাধুলাসহ

নানাবিধ কসরত শিখিয়ে বড় করলেও প্রতিবাদ করার অধিকার তার নাই। সে যেনো মানসিকভাবে দূর্বল অর্থ উপার্জনের এক যন্ত্র ।

সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা জ্বলে মণি ।
যে দেখে পাগল হয় বাইদ্যার নন্দিনী ॥
বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা।
আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা ॥
হাট্টিয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল ।
মুখেতে ফুট্টা উঠে কনক চাম্পপার ফুল ॥
আগল ডাগল আখিরে আসমানের তারা।
তিলেক মাত্র দেখলে কইন্যা না যায় পাশুরা ॥
বাইদ্যার কইন্যার রূপে ভাইরে মুনীর টলে মন।
এই কইন্যা লইয়া বাইদ্যা ভমে তির্ভুবন ॥
পাইয়া সুন্দরী কইন্যা হুমরা বাইদ্যার নারী ।
ভাবা চিন্তা নাম রাখল "মহুয়া সুন্দরী"। (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৪২)

পালাকার মহুয়ার রূপ বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথমেই সাপের মাথার মনি এবং আন্দাইর (অন্ধকার) ঘরের আলোর ন্যায় তুলনা করেছেন, আবার হাসির সাথে পালাকার চাম্পা ফুল ও আখিলকে (চোখ) আসমানের তারা সাথে তুলনা করেছেন। মহুয়ার এমন রূপ দেখে যে কেউ তার চোখের মনি ফেরাতে পারবেনা। উক্ত স্থানে মহুয়ার যেভাবে রূপ বর্ণনা দিয়েছে পালার অন্য কোথাও নদের চাদের বর্ণনা দেন নি। এখানে পালাকার তৎকালীন নারীভাবনা দ্বারা প্রভাবিত এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়েই নারীকে দর্শকের সামনে উস্থাপন করছেন।

গান করিতে আইলাম আমরা নইদ্যার ঠাকুরের বাড়ী ॥
বাজী করলাম তামসা করলাম ইনাম বক্সিস চাই ।
মনে বলে নদ্যার ঠাকুর মন যেন তার পাই ॥ (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৪৪)

পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তে পালাকার একজন নারীর রূপকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। মহুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে নদের চাদের মনে মহুয়ার জন্য প্রেম ভাব জাগ্রত হয়েছে এবং তাকে পাবার বাসনা সৃষ্টি হয়েছে। একজন নারীকে নদেরচাদ তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নয়, বিশ্লেষণ করছে নারীর রুপ- সৌন্দর্য্য দিয়ে। আর এই রূপ-সৌন্দর্য্যবোধও সমাজ দ্বারা নির্মিত হয়েছে। এর প্রভাব দেখা যায় নদেরচাদের আচরণেও। মহুয়াকে না দেখেই তার প্রতি প্রণয়ের লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতীয়মান হয়।

শুন শুন বইন মহুয়া আমার মাথা খাও ।
একলা কেন সন্ধ্যে বেলা জলের ঘাটে যাও ।।
সারা নিশি কাইন্দ্যা পুয়াও চউক্ষে বহে পানি।
একটিবার মনের কথা কওনা কেন শুনি ।।
হাইম ফেলিয়া চাইয়া থাকে ঠাকুরবাড়ির প্রানে
নদ্যা ঠাকুর পাগল হয়েছে শুনছি তোমার পানে ।। (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৪৪)

পালার ঘটনা বর্ণনায় দেখা যায় যে মহুয়া একাধিকবার একা নদীর ঘাটে এসেছে। এবারের উদ্দেশ্য শুধু পানি আনতে যাওয়া নয় বরং নদের চাদের সাথে দেখা করা। লোকচক্ষুর আড়ালে পালার পাত্র- পাত্রীর চলতে থাকা প্রেম- প্রণয় তাদের সমাজের কাছে গোপন থাকলেও পালঙ্ক সই ঠিকই বুঝতে পারে। মহুয়া ব্যক্তি হিসেব ততটাই স্বাধীন যে একজন নারী সন্ধ্যে বেলা একা জলের ঘাটে পানি আনতে যেতে পারে। নিজের সমাজ- গোত্রের আইন- কানুন সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন গোত্রের ছেলের সাথে প্রেমে আবন্ধ হতে কুন্ঠাবোধ করে না। মহুয়া সমাজের প্রচলিত অন্য সকল মেয়ের মতো নয়। বেদে নারী হিসেবে সে তুলনামূলক স্বাধীন বলা যেতে পারে। এই বেদে নারী যে কিনা অর্থ উপার্জনের সক্ষমতা রাখে, তাকেও বেদে সমাজের নিয়ম মেনে চলতে হয়।

এই কথা শুনিয়া মহুয়া ধীরে ধীরে বলে
আগে যাইবাম মইর‍্যা মুরতেক না দেখিলে।
চন্দ্রসূর্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি
নদ্যার চান হইল আমার প্রাণের সোয়ামী। (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৪৭)

উক্ত পয়ারের শুরুতেই দেখা যায় পালাকার বর্ণনা করছে ''এই কথা শুনিয়া মহুয়া ধীরে ধীরে বলে'' ধীরে ধীরে শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে মহুয়ার অন্তর্জালার পূর্ণপ্রতিচ্ছবি পাঠক চিত্তে দৃশ্যায়িত হয়। মহুয়া নদের চাদকে একপলক না দেখলে মৃত্যু পথ বেছে নিতেও পিছপা হবে না, তার কারণ নদের চাদ যে শুধু মহুয়ার প্রেমিক তা নয় প্রচলিত গান্ধর্ব রীতিতে তাকে পতিরূপে গ্রহন করেছে। নদের চাদকে না পেলে তবে তার করণীয় কী? মহুয়ার কাছে মৃত্যুই কি একমাত্র সমাধান? এই ব্যাখ্যায় বলা যায় মহুয়ার প্রচলিত নিয়মরীতির বিরুন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়ার মত যথেষ্ট সামর্থ নেই। প্রয়োজনে সে আত্মহননের পথ বেছে নেবে কিন্তু এই বিষয়ে তার সমাজে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা হুমরা বাইদ্যার সাথে মুখোমুখি আলোচনা করার কোন সামর্থ নেই।

আমি যে অবলা নারী আছে কুল মান
বাপের সঙ্গে নাহি গেলে নাহি থাকব মান।
পড়্যা রইল বাড়ী জমি পড়্যা রইলা তুমি
কেমুন কইর‍্যা পাগল মনে বান্ধ্যা রাখাম আমি। (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৪৮)

মহুয়া পালার এই অংশের শুরুতেই মহুয়া নিজেকে অবলা বলে আখ্যায়িত করছেন। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজ উক্ত অংশে প্রমাণ মেলে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতাবান পুরুষের আদেশ তাকে মেনে নিতে বাধ্য হতে হবে। লড়াই করার সামর্থ তার নেই। প্রয়োজনে আত্মহনন করবে সে। মহুয়ার প্রাণপতি নদের চাদকে হারানোর বিরহ- যাতনা সে মেনে নিতে পারবে না। মহুয়া একদিকে যেমন নিজের সমাজের মান- সম্মানের কথা ভাবছে অপরদিকে নদের চাদের প্রতি তার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। এখানে মহুয়ার নিজের মনোবাসনার চেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার চিত্র। নিজের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে পারছে না।

নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই ॥
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ফিরি।
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর‍্যা মরি ॥
এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা ।
কোন জন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা ॥ (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৪৫)

উক্ত অংশের মহুয়ার বয়ানে মহুয়ার অসহায়ত্বের প্রকাশ মেলে। মহুয়া কতটা নিঃসঙ্গ নিরীহ তা উঠে এসেছে এই অংশে। মহুয়া বিশ্বাস করে তার বাবা ও সহোদর ভাই নেই বলেই হয়তো সে শ্যাওলার মত ভেসে বেড়াচ্ছে। মহুয়া জানে যে, তাকে হুমরা চুরি করে নিয়ে এসেছে, তারপরও নিজের মত করে সে চলতে শিখেছে, শিখেছে নানা রকম কলাকৌশল আর ছলচাতুরি। সে নিজের মত যখন খুশি বাড়ির বাহিরে যায় কিন্তু নিজের জীবনের পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা নেই। এখানে মহুয়ার জীবনের সমস্থ কিছু বিধাতার বিধান হিসেবেই মেনে নিচ্ছে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল
বাপের হাতে ছুরি লইয়্যা ঠাকুরের কাছে গেল (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৫৩)

. . .

একবার দুইবার তিনবার করি।
উঠাইল নামাইল কন্যা বিষলক্ষের ছুরি। (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৫৪)

নাট্য আখ্যানের এক পর্যায়ে মহুয়ার আর নদের চাদের প্রেমের ঘটনা সবাই জেনে গেলে হুমরা তার ষোল বছরের পিতৃত্তের দাবিতে নদের চাদকে হত্যাকরার অনুনয় করে। মহুয়া নদের চাদকে ভালবাসা সত্ত্বেও হুমরার কথায় নদের চাদকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বিষলক্ষের ছুরি নিয়ে যায়। এখানে মহুয়ার নিজস্ব চাওয়া- পাওয়ার প্রতিফলন ঘটে নি রবং উক্ত স্থানে মহুয়াকে ভীরু আর নিষ্ক্রিয় অবস্থান নিতে দেখা যায়। মনে মনে নদের চাদকে ভালবাসলেও মনোঃদৈহিক অবস্থা থেকে মহুয়া তার নিজস্ব ইচ্ছাকে সক্রিয়ভাবে প্রকাশ করতে পারে নি, ফলে মহুয়া নদের চাদকে হত্যার উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

হুমরার ক্ষমতা প্রকাশের ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলির 'স্যটুর'এর ধারণা হতে গ্রামসি শাসন প্রক্রিইয়া ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে। 'স্যটুর' এমন একটি কাল্পনিক প্রাণি যার উপররে অংশ মানুষের এবং নিচের অংশ পশুর, অর্থাৎ একই সাথে মানবীয় এবং একই সাথে জান্তব। শাসনর্কায দুইভাবে পরিচালনা হতে পারে, এক সম্মতি আদায়ের মাধ্যমে ('মানবীয়'), দুই বল প্রয়োগ (জান্তব) করে। এখানে দেখা যায় হুমরা প্রথমে মানবীয় সংকটে ফেলে মহুয়ার উপর বল প্রয়োগ করেছে। পরবর্তীতে কিন্তু জান্তবরূপ প্রকাশ পায় হুমরার পরবর্তী আচরণে।

মহুয়া যখন নদের চাদের সামনে উপস্থিত হয় অর্থাৎ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মহুয়া হুমরা বাইদ্যার কথা ভুলে যায়। একদিকে সমাজের নিয়ম অন্যদিকে ভালবাসা। এই দুই এর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় সেই দ্বান্দ্বিকতার সাথে লড়াই করে মহুয়া নদের চাদতে হত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। মহুয়া যখন হুমরা বাইদ্যার সমানে দাঁড়ায় ঠিক তখন হুমরা বাইদ্যার দেয়া নির্দেশনা মেনে চলে আবার যখন নদের চাদের সামনে দাঁড়ায় ঠিক তখন নদের চাদকে দেখে সব ভুলে যায়।

অভাগী মহুয়া ডাকে আঁখি মেইলা চাও (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৫৪)

মহুয়া পালার মহুয়া নিজেকে অভাগী বলে পরিচয় দিচ্ছে। অভাগীর অভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় হতভাগ্য অর্থাৎ মন্দভাগ্য। মহুয়া নিজেকে অসহায় হিসেবে উপস্থাপন করছে। মহুয়া নিজে শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম হয়েও কেনো নিজেকে অবলা ভাবছে! এখানে মহুয়ার চরিত্রের দ্বারা বোঝা যায় তৎকালিন সমাজে একজন নারী নিজেকে কীভাবে দেখছে। যদিও মহুয়া তার সমাজব্যবস্থাকে পায়ে পিষে নদের সাথে চলে যায়

তাতে মহুয়ার মস্তিকের যে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার জীব অঙ্কুরিত হয়েছিল তা অনুধাবন করা সম্ভব।

"পইড়া থাকুক বাপ মাও পইড়া থাকুক ঘর ।
তোমারে লইয়া বন্ধু যাইবাম দেশান্তর ॥
দুই আঁখি যে দিগে যায় যাইবাম সেই খানে।
আমার সঙ্গে চল বন্ধু যাইবাম গহীন বনে ॥
বাপের আছে তাজি ঘোড়া ঐ না নদীর পারে ।
দুইজনেতে উঠ্যা চল যাইগো দেশান্তরে ॥
না জানিবে বাপ মায় না জানিবে কেহ।
চন্দ্রসূর্য সাক্ষী কইরা ছাইড়া যাইবাম দেশ ॥"
. . .
আবে করে ঝিলিমিলি নদীর কূলে গিয়া ।
দুইজনে চলিল ভালা ঘোড়ায় সুয়ার হইয়া ॥
চান্দ- সুরুজ যেন ঘোড়ায় চড়িল ।
চাবুক খাইয়া ঘোড়া শণেতে উড়িল। (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৫৫)

মহুয়া পালা উক্ত অংশে মহুয়া ও নদের চাদের দেশান্তরি হওয়ার বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। মহুয়া নদের চাদকে নিয়ে যেকোনো স্থানে চলে যেতে প্রস্তুত। এখানে মহুয়ার নির্ভরতার জায়গা নদের চাদ। একা সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও নদের চাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে সে সহমত। ফলস্বরূপ নদের চাদের কথাই গুরুত্ব রাখে। মহুয়া তার পরিবার- পরিজন, জন্ম থেকে সৃষ্ট আত্মীয়- স্বজন সব ছেড়ে নতুন পথে যাত্রা শুধু করে। মহুয়া বলে তারা গহীন বনে থাকতেও কুন্ঠাবোধ করবে না। আবার মহুয়া বাবার ত্যাজি ঘোড়া নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ায় তার সাময়িক সাহসিকতার পরিচয় মেলে।

তোমায় যদি না পাই কন্যা আর না যাইবাম বাড়ি
এই হাতে মার লো কন্যা আমার গলায় ছুরি। (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৫৫)

মহুয়াকে উদ্দেশ্য করে নদের চাদ উক্ত উক্তি করে। নদের চাদ ব্রাহ্মণ সমাজের উচ্চবিত্ত। নদের চাদ ছেড়ে এসেছে তার বাড়ি, বংশমর্যাদা। মহুয়াকে না পেলে সে ফিরবে না। এখানে ভালোবাসার যেমন প্রকাশ পায় পাশাপাশি একজন পুরুষ হিসেবে নদের চাদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এবং একাগ্রতা পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, মহুয়ার সিদ্ধান্ত নদের চাদের সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কিত।

কাল না ডাঙ্গর আঁখি লম্বা মাথার চুল
বিধি আজ মিলাইল মধু ভরা ফুল।

এমন যৌবন কন্যা যায় অকারণ
আমারে ভজহ কন্যা রাখ মোর মন।
এমন সোনার পানসী তাতে মাঝি নাই
যৌবন চলিয়া গেলে কেউ না দিব ঠাঁই। (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৫৭)

মহুয়া পালার এই অংশে আবারও মহুয়ার রূপের বর্নণা পাওয়া যায়। নারীকে মানুষ হিসেবে দেখা হচ্ছে না। নারীর রূপসৌন্দর্যের ভিত্তিতে মহুয়াকে বিশ্লেষণ করছে। তাকে সম্পূর্ণরূপে বর্তমান বাজারি ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। পণ্যে মেয়াদ বসানো থাকে। মেয়াদ উত্তীর্ণের পরে তার কোন মূল্য থাকে না। নারীর ক্ষেত্রেও তাই। উক্ত অংশে মহুয়াকে সাধু বিভিন্ন ভাবে বোঝানো চেষ্টা করছেন যৌবন ছাড়া নারী জীবন অর্থহীন। বণিক এবং পরবর্তীতে সাধুর ক্ষেত্রেও মহুয়াকে ভোগ্যপণ্য হিসেবেই দেখার প্রবণতা প্রকাশ পায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র নারীর শরীর মূখ্য হয়ে উঠেছে নারীর আত্মপরিচয় প্রকাশে।

এতেক শুনিয়া কন্যা কি কাম করিল
সাধুর লাগিয়া কন্যা পান বানাইল
পাহাড়িয়া তক্ষকের বিষ শিরে বান্ধা ছিল
চুন- খয়েরে কন্যা বিষ মিশাইল। (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৫৮)

মহুয়া পালার অন্যতম বিশেষ দৃশ্য মাঝিমাল্লা কর্তৃক মহুয়ার চরিত্রহরণের চেষ্টা, অপরদিকে মহুয়া কর্তৃক মাঝিদের মেরে ফেলা সিদ্ধান্ত। মহুয়ার রূপে মত্ত হয়ে মাঝি-মাল্লা অসহায় মহুয়ার চরিত্রহরণের সিদ্ধান্ত নেয় ঠিক তখন মহুয়ার ভিন্ন চরিত্র দেখা যায়। এখানে মহুয়াকে মনোঃদৈহিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে এবং মহুয়ার কর্তৃক মাঝিমাল্লাদের প্রতিহত করার বিশেষ মুহুর্ত সৃষ্টি হয়। যেখানে মহুয়া এমন বিপদের মুহুর্তে নিজের বুদ্ধিমত্ত্বার পরিচয় দেয়। সে ছলাকলা করে পানে বিষ মিশিয়ে নিজেকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে। এই ছলাকলা করার অভিজ্ঞতা বেদে জাতের এক বিশেষ গুণ হিসেবে ধরা হয় তথাপি মহুয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায়। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তার রয়েছে এবং এমন বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করাটা কম কথা নয় তথাপি সবসময় সক্রিয় হয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তার নেই। পুরুষতন্ত্রের হেজিমনিই এর কারণ।

কও কও কও পক্ষী আরে কও তরুলতা
ঢেউয়ের কুলে পইরা বন্ধু এখন গেলো কোথা
শুন আরে বাঘ- ভালুক পরে আমায় খাও
বন্ধুর উদ্দেশ্য মোরে পরখাইয়া জানাও। (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৫৮)

প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে যে মহুয়া তার ভালবাসার মানুষকে স্বামী হিসেবে মেনে নিয়েছিল সেই প্রকৃতি আর প্রাণিদের প্রশ্ন করছে মহুয়া। খুঁজছে তার পতিকে, যেনো অসহায় মহুয়ার এক আত্মচিৎকার। এখানে মহুয়া একা বনে সাহসী যোদ্ধার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। হিংস বাঘ- ভালুক এর সাথে কথোপকথন হচ্ছে। এখানে মহুয়ার মনোঃদৈহিকভাবে সক্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে। ফুকোর আলোচনা অনুযায়ী ''ক্ষমতা একক কোন ব্যক্তির কাছে পুঞ্জিভূত থাকেনা। ক্ষমতা নেটওয়ার্কের মতো কাজ করে''। (হোসেন, ২০০৭)

এখানে পুরষতন্ত্র নয়, হুমরা বাইদ্যা নয় মহুয়া নিজে ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছে। নিজে লড়াই করে চলেছে।

দূর বনে বাজল বাঁশি শুন্যাছ যে কানে
আসিছে বাদ্যার দল বধিতে পরাণে।
আইজ নিশি থাকরে বন্ধু আমার বুকে শুইয়া।
আর না দেখিব মুখ পরভাতে উঠিয়া। (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৬৩- ৬৪)

বহু কষ্ট সাধনের পর মহুয়া এবং নদের চাদের মিলন হলেও পরবর্তীতে পালার বর্ণিত অংশে মহুয়া ও নদের চাদকে খুঁজতে হুমরা বাইদ্যার দলবল নিয়ে আক্রমনের ঘটনা ঘটে। মহুয়া ধারণা করছে হয়তো আজই তাদের আলাদা হতে হবে। হয়তো তারা এখন এক সাথে কিন্তু ভোর বেলায় তারা আলাদা হয়ে যাবে। এখানে মহুয়াকে তাদের বিপক্ষে প্রতিহত করার কোন প্রকার পরিস্থিতি বর্ণিত হয় নি, বরং মহুয়া বাইদ্যার দলকে ভয় পাবার বিষয় এবং কী হতে পারে তার ভবিষৎ চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে।

সামনেতে হুমরা বাইদা যম যেন খারা।
হাতে লইয়া দাঁড়াই আছে বিষলক্ষের ছুরা।
প্রাণে যদি বাচো কন্যা আমার কথা ধর
বিষলক্ষের ছুরি দিয়া দুষমনেরে মার। (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৬৪)

মহুয়া পালায় কাহিনি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এখানে হুমরা বাইদ্যার দল এর বিপরীতে মহুয়া ও নদের চাদ অবস্থান করছে। একদিকে সমাজের নিয়ম- কানুন অপরদিকে প্রেম। পালাকার এখানে বাইদ্যার দলকে যম বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই যম বিষলক্ষের ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মহুয়াকে হুমরা বাইদ্যার প্রাণ নাসের হুমকি পর্যন্ত দিয়ে বলছেন

প্রাণে যদি বাচো কন্যা আমার কথা ধর।(কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৬৫)

বিশ্লেষিত অংশের সাথে সংযোগ করে বলা যায় পালায় দুইবার হুমরা বাইদ্যা নিজে বিষলক্ষের ছুরি মহুয়ার হাতে তুলে দেয়। পালার প্রথম অংশে আমরা জেনেছি যে হুমরা একজন ডাকাত সর্দার। তিনি নিজেও পারতো নদের চাদকে হত্যা করতে কিন্তু মহুয়ার হাতে বার বার ছুরি তুলে দেয়ার কারণ হিসেবে হুমরা বেইদ্যা তথা পুরুষতন্ত্রের অবাধ্যতার শাস্তি প্রদান করা। নিজের মতো মহুয়াকে খুনি হিসেবে অপরাধে অংশ করে নেয়া। হুমরা বাইদ্যা এক্ষেত্রে তার জান্তব রূপ দেখিয়ে দেয়।

হুমরা বাইদ্যা জানতো যে মহুয়া জানে সে (হুমরা বাইদ্যা) নিজেও একজন খুনি এবং একাধারে তিনি অপহরণকারী। হুমরার জানে যে একবার যদি মহুয়াকে দিয়ে খুন করানো যায় তাহলে হয়তো হুমরার আত্ম গ্লানি হ্রাস পাবে অন্যদিকে শাস্তি দেয়া যাবে অপরাধীকে।

শুন শুন পালঙ্ক সই শুন বলি কথা
কিঞ্চিত বুঝিবে তুমি আমার মনের ব্যথা। (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৬৫)

পালং সই নিজেও একজন নারী। একজন নারী হিসেবে মহুয়ার জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সই নির্বাক দর্শক ন্যায় অবস্থান করতে দেখা যায়। পালং সই একজন নারী হিসেবে নারীর পাশে অবস্থান করে হুমরা বাইদ্যার আর মহুয়ার মধ্যে সমস্যা সমাধানের সক্রিয় ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করতে পারতো। তার কারণ হিসেবে বলা যায় মহুয়া বলছেন

কিঞ্চিত বুঝিবে তুমি আমার মনের কথা। (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৬৫)

এই উক্তির মাধ্যমে মহুয়া আর পালং সইয়ের সাথে আন্ত:সম্পর্কের যে রূপরেখা পাওয়া যায় তাতে মহুয়ার পাশে সইয়ের অবস্থান নেয়াটা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু তৎকালিন সমাজব্যবস্থার বেড়াজালে পালং সই নিজেও আবদ্ধ। তার মত প্রকাশের কোন অধিকার নেই।

পালং সইয়ের চক্ষের জলে ভিজে বসুমাতা
এইখানে সাঙ্গ হইল নইদ্যার চাদের কথা। (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৬৬)

পালং সই সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ। মহুয়ার পক্ষে কথা বলার সাহস তার নেই। কোনো কথা বলার শক্তিও নেই।যদিও স্পিভাক মনে করেন নারীদের নিজস্বতা প্রকাশের সুযোগ নেই। তারা নিম্নবর্গের মধ্যেও নিম্নবর্গ,

স্পিভাক, গায়ত্রী চক্রবর্তী বলেন,

> নিম্নবর্গ কেবল অপজন নয়, নিম্নবর্গ কেবল শোষিত নয়। নিম্নবর্গ কেবল লুটের ভাগ পায়নি তেমন বঞ্চিত তা নয়, তারা কেউ দলিত নয়। সেই হচ্ছে নিম্নবর্গ যার সীমিত সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদে প্রবেশের অধিকার নেই। নিম্নবর্গ হচ্ছে সে, যে সব সময় গমনের পথে আছে। (Spivak, 2004)

নারী নিম্নবর্গের প্রতিরূপ। পালং সই এবং মহুয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা নেই। পালং সই চোখের জল ফেলা ছাড়া কিছু বলার ক্ষমতা রাখে না। মহুয়া কিন্তু মেনে নেয়নি হুমরা বাইদ্যার কথা। আত্মহননের মাধ্যমে সে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে। সে নদের চাদকে পায় নি কিন্তু মেনেও নেয় নি অপরাধ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এই বিদ্রোহকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। মহুয়ার এই আত্মহনন তার ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রকাশক বলতেই হবে। যদিও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বেঁচে থাকতে তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় নি।

ময়মনসিংহ গীতিকায় প্রায় প্রত্যেক পালার নামকরণে পাত্র- পাত্রীর চরিত্রকে গুরুত্ব দেয়। সেই ক্ষেত্রে গীতিকার প্রথম পালায় মহুয়ার চরিত্রের গুরুত্ব অনুসারে *মহুয়া* পালা নামকরণ করা হয়েছে। পালায় মহুয়ার চরিত্রের মূখ্যতাও প্রকাশ পায়। *মহুয়া* পালার মহুয়া চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে পালার পাত্র নদের চাদের গুরুত্ব কোনো অংশেই গৌণ নয়। পালার নামকরণের দিকে মহুয়ার নামানুসারে হলেও পালার শেষাংশে বলা হচ্ছে

"এইখানে সাঙ্গ হইল নইদ্যার চাদের কথা।" (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৬৬)

এখানে মহুয়া ও তার ত্যাগ ও নামকরণের অকার্যকর অবস্থান তৈরি করেছে। পালার নামানুসারে কেনো নদের চাদের কথা শেষ হবার মাধ্যমে শেষ করা কতটা যৌক্তিক ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। পালার নামকরণ এবং কাহিনিবিন্যাস অনুযায়ী "এইখানে সাঙ্গ হইল মহুয়ার কথা" হওয়াটা যুক্তিযুক্ত ছিলো বলে মনে করি।

হোমরা মহুয়ার আসল পিতা নয় জেনেও শৃংখলাবদ্ধ পরিবেশ বা সামাজিকতার কারণে প্রতিবাদ করতে পারে নি। বেদের সমাজে একজন পুরুষের থেকে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি ক্ষমতাধর। ছেলেরা নৌকায় বসে ঘরকন্যার কাজ সামলায় আর মেয়েরা সাপের ঝাঁপি, ঔষধি এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক সামগ্রী নিয়ে গ্রামে বেরিয়ে পড়ে। সেই সমাজের প্রতিফলন অনুযায়ী পালাতেও দেখা যায় হোমরার খেলার দলের কেন্দ্রবিন্দু একজন

নারী। হোমরা তার নিজের হাতে তার জ্ঞান ও শিক্ষায় মহুয়াকে তার মতই একজন করে তুলছে অর্থাৎ হোমরা আর মহুয়া বিদ্যাবুদ্ধিতে সমান পারদর্শী বলে ধরে নেয়া যায়। যার প্রেক্ষিতে দেখা যায় হোমরা বাইদ্যা নদের চাদকে হত্যার জন্য মহুয়ার কাছে প্রথমেই বল প্রয়োগ না করে কৌশলে তার সম্মতি নিতে চায়। ছোটবেলা থেকে তাকে লালন-পালন করে গড়ে তোলার প্রতিদান স্বরূপ নিজের হাতে নদের চাদকে মেরে ফেলতে বলে, কারণ হোমরার মনে ভয় ছিল তার মেয়ে তার দলের সম্পদ। তার দলের মূল কর্ণধার। সুতরাং তাকে জোর করলে নেতিবাচক ফলাফলের আশঙ্কা ছিলো, কিন্তু হোমরা যখন দেখতে পেলো মহুয়াও তাকে দলের অন্যদের মতো ভয় পায় মান্য করে নিজের কথা জানাতে ভয় পায়, এমনকি তার বিরুদ্ধাচারণ করতে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় তখন হোমরা মহুয়ার ওপর বল প্রয়োগ করে তাকে নদের চাদের থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে। যদি শুরুতেই হোমরাকে মহুয়া অন্যরকম করে ভাবাতো তবে আমরা অন্তত এই সময়ের পরিবেশনাগুলোতে দেখতে পেতাম যে মৃত্যু নয় বা অন্য কোন কাল্পনিক জগতে তাদের মিলন নয় ইহজগতে তাদের মিলন নিশ্চিত হতে পেরেছে। বাংলার শাশ্বত প্রেমের দিকটাকে মূখ্য করে করুণ রসে দর্শককে কাঁদিয়ে কাহিনির অন্যান্য দিকগুলো বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় না। ফলে *মহুয়া* এই সময়ের পরিবেশনাগুলোতেও প্রেমে জয়ী হওয়ার জন্য সমাজের নেতিবাচক এবং পুরুষশাসিত সমাজের সাথে যুদ্ধে নিজের মৃত্যুকে একমাত্র অবলম্বন বলে উপস্থাপন করে প্রাচ্যের নারী ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছে। বর্তমান সময়ের চিত্রটা দৃশ্যত ভিন্ন। এখন দেখা যায়, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে তার পরিবারকে তার সিদ্ধান্তের কথা, মতামতের কথা সাবলীলভাবে জানাতে পারছে। যার জন্য তাকে হয়তো অর্থনৈতিক সক্ষমতা দেখানোর প্রয়োজন পড়ে না অথচ সেই সমাজে একজন উপার্জনক্ষম নারী হয়েও মহুয়া নিজের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারে নি। মহুয়ার তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে শারীরিক শক্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে নিভৃতে ব্যক্তিস্বাধীনতার জোরে নিজের মৃত্যুই ছিল বিরাট প্রতিবাদ। ফলশ্রুতিতে বর্তমান সমাজে নারীদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে আমাদের সমাজ কাঠামো কিছুটা হলেও সম্মান করে থাকে বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কাদম্বরী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।' মৃত্যুই কি নারীর প্রতিবাদের চূড়ান্ত পর্যায়! এই একই বক্তব্য পরিষ্কার করে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে কাহিনির শেষে হোমরার অনুতাপের মধ্যদিয়ে। হোমরার অনুতাপে দর্শকচিত্ত বিগলিত হয়। হোমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে বা ভাবতে পারে যে আপনজনকে শাস্তি নয় বরং স্বস্তিতেই ভালোবাসা দেয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নন্দিনী নাটকের রঞ্জন চরিত্রের

যেমন মৃত্যু যক্ষপুরীতে গণজাগরণের উন্মেষ ঘটিয়েছিল, রাজার কঠিন মনকে কোমল করেছিল তেমনি মহুয়ার মৃত্যু সমাজের অহংকার চূর্ণ করেছিল। শেষে হোমরার আদেশেই তাদের দুজনকে একসাথে কবরে শায়িত করা হয়। যেখানে মৃত্যু মানে মৃত্যু নয়, বিজয়েরই নামান্তর।

মহুয়া পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ তৎকালীন নারী সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভে সহায়তা করে। নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কিংবা সমাজের কোনো বিষয়ে মৌখিক স্বীকৃতি লাভ করলেই সেই সমাজ উক্ত ধারণাকে চর্চা করে বলে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। দেখতে হবে তাদের কার্যক্রম। ধর্মের প্রতি ভক্তি এই অঞ্চলের মানুষের ঐতিহ্যগত চর্চা বলা যেতে পারে, বিশেষ করে এ অঞ্চলের আদি ধর্ম সনাতন হওয়ায় দেবীদের প্রতি বিশেষ ভক্তিমূলক উপস্থাপনায় এই অঞ্চলের মানুষকে এগিয়ে থাকতে দেখা যায়। দেবী ভক্তি এ অঞ্চলের মূলে থাকলেও নারীর প্রতি ধারণা কী অবস্থায় রয়েছে তা কিন্তু এই সাহিত্যকর্মগুলো বিশ্লেষণ করলে ধারণা লাভ করা যায়। দেবী চিন্তা যতটা উপস্থাপনাকেন্দ্রিক সামাজিক চর্চায় ততটা দেবী কিংবা তার সামাজিক প্রতিফলন 'নারী'কেন্দ্রিক নয়। নারী এখানে প্রেয়সী, প্রেমিকা, মাতা কিংবা আরাধনার বিপরীতে সহিংসতার ক্ষেত্র হিসেবে অনেক ক্ষেত্রেই বেশি নিপীড়িত হতে দেখা যায়। পাণ্ডুলিপিতেও মহুয়ার প্রতি প্রেম ও মোহনীয় আচরণে ধাবিত করে যতটা তার চেয়ে কামনার, অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার এবং ক্ষমতা কাঠামোকে অমান্য করায় প্রতিহিংসার বস্তু হতে দেখা যায়। কার্ল মার্ক্সের মতে "মানুষ আগে খেতে পারলে তবেই চিন্তা করতে পারে" (খান, ২০০৮)। মহুয়া উর্পাজন করতে সক্ষম হয়লেও কোনো প্রতিবাদ করতে পারে নি। কার্ল মার্ক্স যে মানুষের কথা বলেছে মহুয়া সমাজের চোখে সেই মানুষ হিসেবে তার অবস্থান উপস্থাপনে অপারগ। মহুয়া নাট্যসাহিত্য ব্যাখ্যা নারীর প্রতি এই অঞ্চলের মানুষের নারী সম্বন্ধীয় ধারণা লাভের পাশাপাশি বর্তমান সমাজের দিকে খেয়াল করলে বুঝতে পারা যাবে বর্তমান সমাজের কতটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

Spivak, Gayatri. chakraborty. (2004). *Can The Sublтern speak*. Histoty Workshop journal. 58(58),3-59. Retrievedfrom muse.jhu.edu/journal/history_workshop_journal/summary/v058/58.1barrett.html.

খান, আখতার সোবহান । (২০০৮)। *মার্কসবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী)।

দ্বিজ কানাই।(১৬৫০)। *মহুয়া। (দৃশ্যকাব্য) দ্বিজ কানাই প্রণীত (প্রাচীন পল্লীনাটিকা)*। আলম্ মাহবুবুল। সম্পাদিত। ২০১৯, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

হোসেন, পারভেজ। (২০০৭) *মিশেল ফুকো: পাঠ ও বিবেচনা।* ঢাকা: সংবেদ প্রকাশনা।

বোভোয়ার, সিমোন দ্য। (১৯৪৯) *দ্বিতীয় লিঙ্গ*, হুমায়ুন আজাদ (অনুবাদ ২০০৭), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, পৃ. ১৮৩

চতুর্থ অধ্যায়

সমকালীন প্রযোজনায় নারীর প্রতিরূপায়ণ

মহুয়া মঞ্চায়নে ময়মনসিংহের উদীচী শিল্পগোষ্ঠী অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

> বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী (সংক্ষেপে- উদীচী) হচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক সংগঠন। ১৯৬৮ সালে বিপ্লবী কথাশিল্পী সত্যেনসেন উদীচী গঠন করেন। পরবর্তী সময়ে রণেশ দাশগুপ্ত, শহীদুল্লাহ কায়সারসহ একঝাঁক তরুণ উদীচীর সাথে সম্পৃক্ত হন। জন্মলগ্ন থেকে উদীচী অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্যের সমাজ নির্মাণের সংগ্রাম করে আসছে। উদীচী '৬৮, '৬৯, '৭০, '৭১ সালে বাঙালির সার্বিক মুক্তির চেতনাকে ধারণ করে গড়ে তোলে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম। এ সংগ্রাম গ্রাম-বাংলার পথে-ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালে উদীচীর অনেক কর্মী প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। দেশের সকল গণতান্ত্রিক, মৌলবাদবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে এ সংগঠন বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানে সারাদেশে উদীচীর তিন শতাধিক শাখা রয়েছে। দেশের বাইরেও ছয়টি দেশে শাখা রয়েছে উদীচীর। ২০১৩ সালে এই সংগঠনটি দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা একুশে পদক লাভ করে।
>
> উদীচী প্রযোজিত মঞ্চনাটকসমূহের মধ্যে নরক গুলজার, মিছিল, ধলা গেরামের নাম, অভিশপ্ত নগরী, চিরকুমার সভা, বিবাহ উৎসব, বৌ বসন্তি, শুভ্র তিমির, চিলেকোঠার সেপাই, ও হাফ আখড়াই প্রধান। পথনাটকগুলির মধ্যে রয়েছে আরো মানুষ চাই, দিন বদলের পালা, রাজা রাজা খেলা, মাদারীর খেলা, তেভাগার পালা, রাজাকারের প্যাঁচালী, স্বাধীনতার সংগ্রাম, ইতিহাস কথা কও, তাঁতাল, সংগ্রামই সুন্দর ইত্যাদি। এর মধ্যে "ইতিহাস কথা কও' গীতি আলেখ্যটি বাংলাদেশের হাটে মাঠে ঘাটে শত সহস্রবার পরিবেশিত হয়েছে। (উইকিপিডিয়া, ২০১৭)

গীতি নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে 'উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ময়মনসিংহ'র উল্লেখযোগ্য কাজ হল *মহুয়া, মলুয়া, নকশীকাঁথার মাঠ* প্রভৃতি। ৩০ শে অক্টোবর ২০২১ ইং তারিখে উদীচীর '*মহুয়া* পালা'র শিল্পীবৃন্দদের সাথে মাঠ পর্যায়ে কাজের জন্য আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পালার কুশলী সারওয়ার কামাল রবীন (বিবিধ চরিত্র), তাপস চক্রবর্তী (নদের চাদ) এবং ফাহমিদা ইয়াসমিন রুনা (মহুয়া)। ফাহমিদা ইয়াসমিন রুনা (৫৪) ১৬/১৭ বছর বয়সে *মহুয়া* পালায় অভিনয় করা শুরু করেন। তাপস চক্রবর্তী (৬৫) আনুমানিক ১৭/১৮ বছর বয়সে *মহুয়া* পালায় নদের চাদ চরিত্রে অভিনয় শুরু করেন। নির্দেশক যোগেশ দাস (মৃত) নৃত্যনাট্য আঙ্গিকে *মহুয়া* পালা নির্দেশনা দেন। *মহুয়া* পালার মঞ্চায়ন শুরু হয় আনুমানিক ১৯৮১ সাল থেকে। সর্বশেষ মঞ্চায়ন হয়েছিল ২০১৭ সালে। পালার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭২ মিনিট। নির্দেশক যোগেশ দাস মহুয়া পালাকে সম্পূর্ণ গ্রামীণ আবেশে তৈরী করেছেন।

উদীচী সংগঠনে পুরুষ শিল্পীদের তুলনায় নারীশিল্পী অনেক বেশি। সারোয়ার কামাল রবীন বলেন, "আমরা ছেলে শিল্পীদের সংকটে ভুগছি।" (সারোয়ার কামাল রবীন, ২০২১) সুতরাং উদীচীর ক্ষেত্রে শিল্পচর্চায় নারীদের অগ্রগতি বেশি দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীটাকে নিজের মতো করে দেখা, স্বাধীনতা, উন্নত ভাবনা, প্রগতির প্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে মেয়েরা শিল্পচর্চার অগ্রগতির দিকে এগিয়ে আসছে। উদীচী সংগঠনের নারী শিল্পীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তারই প্রমাণ। রবিন বলেন, "অনেক জায়গায় দেখেছি পুরুষদেরকে নারীরূপে সজ্জিত করে অনুষ্ঠান করানো হয়েছে, কিন্তু আমরা আমাদের অনেক নাটকে মেয়েদেরকে পুরুষ বানিয়ে অভিনয় করিয়েছি কারণ আমাদের এখানে নারীর তুলনায় পুরুষ অভিনেতার সংখ্যা অনেক কম।" (রবীন, ২০২১) যেমন, মহুয়া চরিত্রের অভিনেত্রী নিজেই কয়েকবার হোমরা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। পুরুষ শিল্পীর সংকটের ব্যাপারে জানতে চাইলে তারা বর্তমান বিনোদনের মাধ্যম পরিবর্তনকে দায়ী করেছেন। এখন বৈশ্বিক প্রযুক্তি নবীনদের বেশি আকৃষ্ট করে।

সে সময়ে ***মহুয়া*** পালাকে মঞ্চায়নের জন্য নির্বাচন করার কারণ জানতে চাইলে দলের সাবেক সেক্রেটারি জনাব সারোয়ার কামাল রবীন বলেন,

> ধনী গরীবের প্রেম ভালোবাসা উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে তৎকালীন সমাজের শ্রেণিবৈষম্য উদঘাটনের মাধ্যমে শ্রেণিসচেতনতা বৃদ্ধি করা ছিলো আমাদের উদ্দেশ্য। উদীচী তার শৈল্পিক দায়িত্বের জায়গা থেকে এবং রাজনীতি সচেতন দল হিসেবে সমাজ সংস্কারমূলক কাজে বিশ্বাস করে। সেই বিশ্বাসের জায়গা থেকে এই কাহিনির শ্রেণি দ্বন্দ্বের বিষয়টা পালাটি নির্বাচনের অন্যতম কারণ। আবার মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যান্য কাহিনি থেকে সাধারণ মানুষকে মহুয়ার গানের সুর বেশি আকৃষ্ট করে। (রবীন, ২০২১)

তাপস বাবু বলেন, "*মহুয়া*'র জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হলো ***মহুয়া*** পালা বিয়োগাত্মক। আমরা এমনও দেখেছি আমাদের নাটক শেষে দর্শক হাউমাউ করে কেঁদেছেন মহুয়ার মৃত্যুতে।" (তাপস, ২০২১)

মহুয়া পালা'র পুরো বন্দনাতে নারী দেবীর নামের উল্লেখ নেই কেনো? আপনাদের পরিবেশনায় এর কোন পরিবর্তন আছে কি? এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বর্তমান সভাপতি প্রদীপ চন্দ্র কর বলেন, "এখানে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নিয়ে বন্দনা করা হয় নি এখানে তো ক্ষীর নদী, মালামের পাথর এসবের কথা বলা হয়েছে। "আপনি ব্যাখ্যা করে দেখবেন যে প্রায় সব পালাতেই একই রকম বন্দনা হয় তাই এই পালাতেও এভাবেই আছে।" (কর, ২০২১)

আপনাদের প্রযোজনায় সেটসহ অন্যান্য পরিকল্পনা কেমন ছিলো? এ প্রশ্নের উত্তরে দলের সদস্যরা বলেন, সমগ্র গল্পে বেদে সমাজের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অভিনেতারা বলেন, নির্দেশক যোগেশ দাস ঠিক যেই রীতিতে *মহুয়া* পালা নির্দেশনা দিয়েছিলেন সেখানে নতুন কলাকুশলী সংযোজন-বিয়োজন করলে পরিকল্পনা ও রীতির ক্ষেত্রে তারা এখনো সেই একইভাবে *মহুয়া* পালা মঞ্চায়ন করে আসছেন। উদীচী তৎকালীন বেদে সমাজ, তাদের জীবনাচরণ সর্বোপরি *মহুয়া*'র মূল প্রেক্ষাপটকে অপরিবর্তনীয়ভাবে জনসমক্ষে উপস্থাপন করতে চান। তারা *মহুয়া* পালার সেই চিরন্তন আবেশকে বাদ দিতে চান না। এ প্রসঙ্গে প্রবীণ অভিনেতা সারোয়ার কামাল রবীন বলেন, "আরে মহুয়া তো বাইদার ছেরি, তার মাথায় এখন আমি প্লাস্টিকের ফুল যুক্ত করে দিলে কি এটা ঠিক! তখন কি এটা ছিলো!" (রবীন, ২০২১) এ প্রসঙ্গে *মহুয়া* পালার অভিনেত্রী ফাহমিদা ইয়াসমিন রুনা যুক্ত করেন, "তখনকার সমাজের যে পোশাক ঠিক সেই পোশাকটা, সেই শাড়িটা, ঠিক ততটুকুই উঁচুতে পড়তে হবে বলে আমাদের গুরু যোগেশ দাসের নির্দেশনা ছিল।" (রুনা, ২০২১) সারোয়ার কামাল রবীন আরো বলেন,

> সে আমলে তাদের যে কালচার ছিল, তাই তুলে ধরা হয়েছিল আমাদের পরিবেশনায় কিন্তু এখনকার সময়ে ঢাকায় মহুয়ার পোশাক দেখলে মাথা নষ্ট হয়ে যায়। তাকে আর মহুয়া বলে মনে হয় না। জমিদারের মেয়ে মনে হয় আর এটা নিয়ে আমাদের দ্বিমত আছে। (রবীন, ২০২১)

অভিনয়ের প্রস্তুতি এবং পোশাকের ক্ষেত্রে নির্দেশক বাস্তববাদী চিন্তা করেছিলেন। কখনোবা প্রকৃতিবাদ ধারাতেও দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন যা উদীচী নাট্যশিল্পীরা এত বছর পরেও পরিবর্তন করেন নি এবং ভবিষ্যতে পরিবর্তন করতে আগ্রহীও নন। যদিও ময়মনসিংহ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশিত মহুয়ার নৃত্যনাট্যের গ্রন্থকার অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক তাঁর লেখায় গীতিকারের থেকে ভিন্ন শব্দ ও পয়ার ব্যবহার করেছেন। তিনি সমাপ্তিতে মূল গীতিকারের চিন্তা থেকে এক ধাপ সামনে এগিয়ে পালার সমাপ্তি করেছেন। নদের চাদের ইহজাগতিক মৃত্যুর পর পরলোকে তাদের মিলিত করিয়েছেন। ইহজাগতিক, সামাজিক রীতিনীতি বিধি-নিষেধ তাদের মিলনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে গ্রন্থকার এই মৌলবাদী সমাজ থেকে বের হয়ে এমন এক সমাজের কল্পনা করেছেন। এমন এক জগতের কল্পনা করেছেন যেখানে শ্রেণি বৈষম্য নেই, পিতৃতান্ত্রিকতা নেই, শাসকের শাসন নেই, পরাধীনতা নেই, যেখানে সবাই সবার ইচ্ছেকে সম্মান দেয়, নারী-পুরুষের অহং নয় কেবল মানুষরূপে

মানুষকে সম্মান দেয়, তেমন সমাজে নিয়ে তিনি এই অতৃপ্ত যুগলের মৃত্যু পরবর্তী মিলন দেখান।

তাদের মতে, চরিত্রায়নের এর ক্ষেত্রে অভিনেতাদের কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি কারণ নির্দেশক তাদেরকে সরাসরি বেদে সমাজের চাল-চিত্র প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করেছিলেন। মহুয়াসহ অন্যান্য চরিত্রের জীবনাচরণ, মনস্তত্ত্ব এবং পারস্পারিক সম্পর্ক বুননের চিত্র সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। মহুয়া চরিত্রের নাম ভূমিকার অভিনেত্রী রুনা বলেন, ''আমি মহুয়ার মত হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি। তার মত হাঁটাচলা, কথা বলা এমনকি তার কোমরের যে ভাঁজটা থাকবে ঠিক সেই রকম চলতে চেষ্টা করেছি। তার ওঠাবসাটাও একদম ঐরকম করার চেষ্টা করতাম।'' (রুনা, ২০২১)। যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে বেদে কোন নারীর সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশগ্রহণ করেন নি। সমাজে নারীর অভিকরণশীলতা প্রকাশ পায় রুনার আলোচনায়। কোমরের ভাঁজ নারী অভিনেত্রীর জন্য বিশেষ লক্ষণীয়। নারীকে রূপ এবং শরীর কাঠামোতে যৌন আকাংখ্যার মাধ্যম করে তোলাটা জরুরী। চরিত্রের দর্শন বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তারা চরিত্রের ভাবটাকে অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন। নির্দেশক অনেক বেশি জোর দিয়েছিলেন বেদে সম্প্রদায়ের জীবনাচরণের দিকে। এক্ষেত্রে তারা জেনেছিলেন বেদে সমাজে কোনো নারী সর্দারের সামনে তার বক্তব্য বা মতামত রাখতে পারত না। এছাড়াও বেদে সমাজের জীবনাচরণ, জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম, গোষ্ঠীবদ্ধ সংস্কৃতি, তাদের ভেতরকার সমাজনীতি, প্রথা, পারিবারিক বিষয় ইত্যাদি খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। *মহুয়া* পালা মঞ্চায়নের জন্য তাপস চক্রবর্তীর কথা অনুসারে বলা যায়, তাদের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক যদিও বহুলাংশে এই মাতৃতান্ত্রিকতা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরিকাঠামো কেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এর অন্তর্ভূক্ত নয়। যেমন অভিনেতা তাপস চক্রবর্তী বলেন,

> আমরা প্রায় ১৫ দিনের মতো তাদের কাছ থেকে দেখেছিলাম। মেয়েরা তথা বেদেনিরা সকালবেলা হলেই সাপের ঝাঁপি মাথায় নিয়ে গ্রামে বেরিয়ে যেত আর বেদেরা সংসার করত রান্নাবান্না করত। (চক্রবর্তী, ২০২১)

একথা থেকে জানা যায় তৎকালীন বেদে সমাজে নারী কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষমতাসীন ছিল, স্বাধীন ছিলো তবে সিদ্ধান্ত নিতো পুরষ দলপ্রধান পুরুষ। মাতৃতান্ত্রিকতার খোলসে পিতৃতান্ত্রিকতার বীজমন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। হোমরা বাইদ্যা বারবার মহুয়ার হাতে ছুরি তুলে দেয় নিজের হাতে নদের চাদকে মারার জন্য। যেখানে হোমরা নিজেই বলবান একজন ব্যক্তি, তাছাড়াও তার

দলে অন্য অনেকে আছে যারা তার এক কথায় নদের চাদকে খুন করতে পারত। মহুয়াকে নানাভাবে বাধ্য করার চেষ্টা করে নদের চাদকে নিজের হাতে খুন করতে। এ প্রসঙ্গে দলের সবাই প্রায় সমস্বরে বলে ওঠেন, দলের সর্দারের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার শাস্তিস্বরূপ মহুয়াকে এই কাজ করতে বলে হোমরা। মহুয়া নিজে অনুধাবন করতে পারে সে ভুল করেছে এবং মহুয়াকে দেখে যেন অন্য কেউ এই কাজের পুনরাবৃত্তি করার সাহস না পায়। পাশাপাশি সর্দারের প্রতি দলের সদস্যরা যেন আরো বেশি অনুগত থাকে। তাকে ভয় পায়। অর্থাৎ হোমরা পুরো বেদে সমাজে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যই মহুয়াকে তার কর্মের শাস্তি দেওয়ার জন্য এই কাজ করেন।

এ থেকে বোঝা যায় মাতৃতান্ত্রিকতার আড়ালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী আপাত দৃষ্টিতে স্বাধীন মনে হলেও, উপার্জনে সক্ষম হলেও একজন পুরুষই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের নেতৃস্থানীয় আসনটি তার জন্যই। সেখান থেকে সে নিজে অন্যদের ভালো-মন্দ বিচার করবে, আর নিজেকে বিচার বিবেচনার উর্ধ্বে রাখবে। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের বশবর্তী হয়ে হোমরা নিজের পালিত মেয়ের সামনেও নিজের শক্তি আর ক্ষমতার প্রদর্শন করতে ভোলে না। একজন নারীকে তার প্রেমের অপরাধে সেই প্রেমিককে তার হাতেই হত্যা করিয়ে গোত্রের সর্দারের বাইরে যাওয়ার দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ করে রাখতে চায় হোমরা। নারীকে তার কর্মের শাস্তি দেয়ার অধিকার নিজের হাতে রেখে বা ক্ষমতা কাঠামোয় নারীর উপর নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করে নিজেকে শক্তিশালী প্রমাণ করতে চায় হোমরা।

চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে চরিত্র থেকে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য কোথায় এবং কিভাবে খুঁজে পেয়েছেন জানতে চাইলে অভিনেত্রী রুনা বলেন,

> নারী হিসেবে মহুয়া কিন্তু অনেক সাহসী। ওই সময়ের নারী হওয়া সত্ত্বেও মহুয়ার ভেতরে একটা সাহসিকতা আছে। যা সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে প্রমাণ করেছে। হোমরার আদেশ না মেনে সে নিজের জীবন দিয়ে দেয়। সুতরাং মহুয়া অনেক সাহসী একজন নারী। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান সমাজের মেয়েদের থেকেও বেশী। যেমন আমি আমার মেয়েকে অনেকক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্রের অনেক বিধি-নিষেধ মানতে বলি, বাধ্য করি। আমি কিন্তু রাজনীতি সচেতন একজন মানুষ। (রুনা, ২০২১)

মহুয়ার আত্মহনন কেনো? এমন জিজ্ঞাসায় তারা বলেন যে, মহুয়ার মৃত্যু মানেই সমাপ্তি নয়। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এটা হেরে যাওয়া নয়, এটা তার

প্রতিবাদ, বিরোধিতা এবং বশ্যতা স্বীকার না করার আহ্বান। মহুয়া নিজের জীবন দিয়ে তৎকালীন সমাজের প্রথাকে, পুরুষতান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করেছে।

শেষে মহুয়ার মৃত্যুর পর হুমরার যে অনুতাপ, সে অনুতাপের জন্য একজন নারীকে তার জীবন উৎসর্গ করতে হচ্ছে। মৃত্যু ছাড়া এই সমাজের বোধোদয়ের কোনো বিকল্প কি হতে পারে না! এ প্রসঙ্গে উদীচী শিল্পীদের কথায় *মহুয়া* পরিবেশেনায় তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট উদাহরণ হিসেবে সামনে এসে যায়। মহুয়া তার সমসাময়িক সমাজ কাঠামোতে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকেই সমাধানের একমাত্র উপায় হিসেবে খুঁজে পেয়েছিল, কারণ পালিয়ে বাঁচা তার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। তার পিতার আদেশে নিজের ভালোবাসার মানুষকে খুন করাও ছিল তার পক্ষে অসম্ভব। এক্ষেত্রে নিজের মুত্যুটাই ছিল তার প্রতিবাদের হাতিয়ার। যার দ্বারা সে হোমরাকে তার কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত হতে বাধ্য করে। যদিও তারা তাদের প্রযোজনায় মহুয়ার মৃত্যু দেখায় নি। মহুয়া এবং নদের চাদের মিলন দেখিয়ে তারা পাণ্ডুলিপির পরিণতিকেও মোকাবেলা করেন। তাদের মতে মহুয়ার মতো নারী পলায়নপর হতে পারেন না। মৃত্যুই একমাত্র সমাধান নয়।

পালার শেষাংশে পালাকারের রচিত বাক্য নিয়ে এ দলের নির্দেশকসহ শিল্পীরাও দ্বিমত পোষণ করেন ফলে তারা গীতিকারের শেষ সংলাপ "নদের চাঁদের কথা"র এর সাথে বিরোধিতা করে নিজেদের উপস্থাপনার শেষে বলে যে, এইখানে "সাঙ্গ হইল মহুয়ার কথা।" কারণ পুরো নাটকটা জুড়েই মহুয়া চরিত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। মহুয়া চরিত্রের আত্মত্যাগ সমগ্র নাটকে অনেক বেশি। পুরো কাহিনিকে তারা দেখেছেন একজন নারীর জীবনের বেদনা ও অসহায়ত্বের দিক থেকে ফলে মহুয়ার আত্মাহুতি ও পুরো নাটকে তার আত্মত্যাগের পরিধি বিচারের মাধ্যমে প্রযোজনার শেষের কথায় মহুয়ার কথা বলাটাই কার্যকর বলে তারা মনে করেন।

বহুরূপী নাট্য সংস্থা

পরিবেশনায়: বহুরূপীর নাট্য সংস্থা, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের অন্যতম নাটকের দল "বহুরূপী নাট্য সংস্থা"র সাংগঠনিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৭৫ সালের পহেলা জুন। এখন পর্যন্ত মোট ৬৪ টি প্রযোজনা আছে এই নাট্য সংস্থার ঝুলিতে। তার মধ্যে নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে মহুয়া তাদের অন্যতম কাজ। শাহাদাত হোসেন খান হিলু বলেন,

> আনুমানিক ১৯৯৬ সালে *মহুয়া* পালার যাত্রা শুরু হয়। মহুয়ার সর্বশেষ মঞ্চায়ন হয়েছে ২০১৯ এর ফেব্রুয়ারি মাসে। *মহুয়া* পালা নৃত্যনাট্য আঙ্গিকে নির্দেশনা দেয়া হয়। অভিনেতা ছিলেন সুধীর দাস। শিল্প নির্দেশনায় ছিলেন শাহাদাত হোসেন খান হিলু। (হিলু, ২০২১

করোনা পরিস্থিতির জন্য বহুরুপী নাট্য সংস্থায় শুধু শিল্প নির্দেশক জনাব হিলু সাহেবকেই পাওয়া যায়। তার সাথে কথোপকথনের প্রেক্ষিতেই নিম্নোক্ত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছে।

মহুয়া পালার কোন সংকট সবচেয়ে বেশি মূখ্য বলে মনে হয়? এই প্রশ্নে পালার শিল্পনির্দেশক মো. শাহাদাত হোসেনের কথায় বোঝা যায়-

> শ্রেণিবৈষম্য বাদ দিয়েও *মহুয়া* পরিবেশনায় তাদের বক্তব্য ছিল চিরন্তন প্রেম তথা প্রকৃতি ও জীবনধারার মধ্যকার প্রেমটাকে প্রাধান্য দেয়া। যে প্রেম ছিল মানবিক সেই প্রেমকে মঞ্চে তুলে আনা ছিল উদ্দেশ্য। আমাদের প্রকৃতি ও জীবন ধারায় প্রেম ছাড়া কিছু নেই। কথায় আছে পিরিত রতন পিরিত যতন পিরিত গলার হার

পিরিত কইরা যে জন মরে সফল জনম তার। সে প্রেম মানসিকও হতে পারে শারীরিকও হতে পারে। (হিলু, ২০২১)

মহুয়া নৃত্যনাট্য

এই চিরায়ত প্রেমটাকে মঞ্চে তুলে আনার জন্যই *মহুয়া* প্রযোজিত হয়েছে। কেনো হোমরা বাইদ্যা মহুয়া ও নদের চাদের মিলন মেনে নেন নি এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> হোমরা তার গোত্রকে অনেক বড় করে দেখে। নিজের অহংবোধ থেকে বের হতে চায় না। তাদেরকে হারানোর পর সে তাদের প্রেমানুভূতি অনুভব করে তার আগে বুঝতে পারে না। নিজের গোত্রের ধর্মের-বর্ণের শ্রেণির সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য, নিজের কর্মের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য, বেদে সমাজের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য, মহুয়াকে নদের চাদের হাতে তুলে দিতে সে অসম্মতি প্রকাশ করে। (হিলু, ২০২১)

সেই সময়ে *মহুয়া* পালার মধ্যে দেখা যায় নারীকে নানাবিধ অবদমনের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো। সেই ব্যাপারটা কি এখনো আমাদের সমাজে বা আপনাদের পরিবেশনায় আছে জানতে চাইলে হিলু বলেন-

> সে সময়ে নারীর উপর যে দমন ছিলো তা এখনো বিদ্যমান আছে। একইভাবে না থাকলেও তা ভিন্ন ভাবে এখনও হয়ে আসছে। যেমন, আমাদের প্রাণিজগতের বায়োলজিক্যাল একটা নীড (need) আছে কিন্তু তাদের একটা সময় আছে যা মানুষের নেই। মানুষ তার প্রকৃতির নিয়মে চলতে পারে না। যেমন মহুয়াকে দেখে ৮০ বছরের একজন বৃদ্ধও তারুণ্য অনুভব করে। তার মানে নারী সবসময়ই পুরুষকে উত্তেজিত করার উপাদান, নইলে ৮০ বছরের বৃদ্ধের তার নাতনীর বয়সী একজন মেয়েকে দেখে এত কামুক হবে কেন! পরনারীকে দেখলেই আমাদের রিপু জাগরিত হয় আর এই মনস্তত্ত্বটা এখনো আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে। (হিলু, ২০২১)

সমাজে পুরুষের প্রতি নারীর কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার সুযোগ ছিলো নাই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী অর্থ আয়ের উৎস হতে পারে কিন্তু দলের নেতা অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধান যাই বলুক, সামাজিক চর্চায় এর বিপরীত দিকটাই দৃষ্টিগোচর হয়।

> বাংলাদেশের সংবিধানের ১০ নম্বর ধারায় জনজীবনে নারীর অধিকার স্বীকৃত। ২৭ ও ২৮ ধারায় বলা হয়েছে, নারী-পুরুষ ভেদে কোনো রকম বৈষম্য দেখানো যাবে না। ২৮ ধারার ক অনুচ্ছেদে সমাজের পশ্চাৎপদ অংশকে অগ্রবর্তী অংশের সমপর্যায়ে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে এই সমঅধিকারের স্বীকৃতি সত্ত্বেও পারিবারিক আইন তথা বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকার স্বত্বের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য রয়েছে। নারীকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিতে পরিণত করা হয়েছে। নারী কিন্তু সন্তানের অভিভাবকত্ব কখনো পায় না, ৭ বছর পর্যন্ত দেখাশোনা করতে পারে মাত্র। এখানে আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো, নারীকে সন্তানের হেফাজতের দায়িত্ব দেওয়া হল অথচ অভিভাবকত্ব দেওয়া হল না। (কামাল, ২০১০, পৃ: ১৮)

বাংলাদেশের সংবিধান নারী-পুরুষের বৈষম্য দেখানো যাবে না বলে স্বীকার করলেও স্বয়ং সংবিধানের বিধিতে তার ব্যত্যয় ঘটেছে দেখ যায়।

> বাংলাদেশের যে নাগরিকত্ব আইন তাতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের কোনো পুরুষ নাগরিক বিদেশী নারীকে বিয়ে করলে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে যাবেন কিন্তু বাংলাদেশের কোনো নারী নাগরিক বিদেশী পুরুষকে বিয়ে করলে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারবেন না। আসলে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র নাগরিক নারীকে ব্যক্তি হিসেবে কখনো মর্যাদা দেয় নি। (কামাল, ২০১০, পৃ: ১৯)

অর্থাৎ দেশের কাঠামো সুনিশ্চিত করছে নারীদের অবস্থান। যতই মৌখিকভাবে নারী অধিকারের কথা বলে থাকি কিংবা লিখিতভাবে নারীকে সমান অধিকার বা বৈষম্যের স্বীকার না হবার কথা উল্লেখ করি না কেনো নাগরিকত্ব আইনে কিন্তু ভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হচ্ছে। নারী সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সে দৈহিক ভাবে যতটা কার্যকর অধিকারে ঠিক তার উল্টো।

নারীর প্রতি পুরুষের দৈহিক তাড়না সম্বন্ধীয় মানসিকতাকে নিয়ে প্রশ্ন করে শাহাদাত হোসেন খান হিলু বলেন-

> এই তাড়নাকে আমি কেনো নিয়ন্ত্রিত করতে পারি না, এটা কি আমার মানসিক সমস্যা নাকি এটাকে খুব সহজলভ্য মনে করি বিধায় নিয়ন্ত্রণ করতে চাই না? আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের থেকে যা পেয়েছি তা এখনও নানাভাবে নানা রূপে আমাদের সমাজকে প্রভাবিত করে চলেছে। যার ফলে নারীরা এখনো আমাদের কাছে দমনের বস্তু। তাদেরকে অবদমন করাই আমাদের পুরুষত্বের প্রমাণ। (হিলু, ২০২১)

নারীর শরীর পুরুষতন্ত্রের কাছে লোভনীয় হবার পাশাপাশি নারীর হীনমন্যতা কারন হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

কেইট মিলেট নারী পুরুষের এই আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্ককে যৌন সম্পর্কের সাথে যুক্ত করে ব্যাখ্যা করেছেন। যৌনবাদী আধিপত্য হলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকা আদর্শ যা ক্ষমতার মৌলিক ধারণা জোগায়। যেখানে ক্ষমতা প্রয়োগের সকল পথ পুরুষের কাছে। মিলেট ভাবাদর্শগতভাবে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে আদর্শগত ক্ষেত্রে সম্মতি আদায়ের মধ্যদিয়ে নারী ও পুরুষকে সামাজিকীকরণ করে। (Millett, 1969)

নিজে ক্ষমতাবান হওয়ার পরও নদের চাদকে মারার জন্য হোমরা বারবার মহুয়ার হাতে কেনো ছুরি তুলে দেয়? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতে জানা যায়-

> মহুয়াকে দমনের চেষ্টা করেছে হোমরা যেখানে মহুয়া কখনো হোমরার প্রতিবাদ করতে পারছে না কারণ সে শৃঙ্খলিত, আবদ্ধ। তবে তার মনে যখন প্রেম এসেছে তখন সে কিছুটা বিরুদ্ধাচরণ করেছে। সে কোনো কিছু মানে নি। এখনও আমাদের মাঝে যখন কেউ প্রেমে পড়ে অর্থাৎ প্রেমে ফানাফিল্লাহ হয়ে যায় তখন মানুষ কোনো কিছুরই পরোয়া করে না। আর নদের চাদের প্রেমও শারীরিক প্রেমের উর্ধ্বে উঠে আত্মায় বিলীন হয়ে গেছে যার ফলে মহুয়া আর কোনো কিছুকেই বিবেচনা না করে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। (হিলু, ২০২১)

আত্মহত্যার আগে মহুয়া তার প্রতি হওয়া অন্যায়গুলোর কথা বলছে এবং পরক্ষণেই সে নিজেকে হনন করছে, কেনো? শাহাদাত হোসেন খান হিলু বলেন,

> আত্মহনন করছে কারণ সে তো শৃঙ্খলিত। যে শৃঙ্খল ভেঙে সে বেরোতে পারছে না। পালিয়ে চলে আসার পরেও হোমরার রক্তচক্ষুর প্রতিবাদ যেমন করতে পারছে না তেমনি অন্য কোনো উপায়ও খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর বলা হচ্ছে যে তুমি তাকে হত্যা করো। সে তো তাকে হত্যা করতে পারবে না। কারন সে নিজের জীবনকে নয় ভালোবাসা কে জীবিত রাখতে চেয়েছে। নদের চাদ তার প্রেম। সেই প্রেমকে মেরে ফেললে তো প্রেমই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই সে সংসারে প্রেমকে জীবিত রেখে নিজের বুকে ছুরিকাঘাত করেছে। সে নিজের জীবন দিয়ে হোমরার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রেমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। সমাজের রক্তচক্ষু বিজড়িত শাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বলছে, এখন তুমি কার উপর শাসন করবে! সে আত্মাহুতি না দিলে হয়তো এটা শেষ হবে না। সুতরাং মহুয়ার মৃত্যুটা ছিল সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। (হিলু, ২০২১)

হোমরা কেন বারবার নদেরর চাদকে হত্যার জন্য মহুয়াকে আদেশ দেয়? নিজে কেনো মারে না? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,

> বাইদ্যার মধ্যে তো কোনো ভালোবাসা থাকে না। বাইদার কাজ হইলো ছলা কলায় পারদর্শী হওয়ার মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করে অর্থ উপার্জন করা। সেখানে তুমি কিসের প্রেম করেছ! তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। (হিলু, ২০২১)

সুতরাং প্রেমের অধিকার বাইদ্যার নারীর নেই। সে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের হারিয়ার। হোমরার এই আদেশ মহুয়ার জন্য শাস্তি স্বরূপ বলে শিল্প নির্দেশক শাহাদাত হোসেন হিলু মনে করেছেন।

এই বাইদ্যার সমাজের পিতৃতান্ত্রিকতা সেটা কি আপনার দলে কোন ভাবে কাজ করে যার ফলে নারী শিল্পী এত কম? এ ব্যাপারে হিলু বলেন যে,

> আমাদের দলে পিতৃতন্ত্রের প্রভাব নেই কিন্তু এটি আমাদের সমাজের পরিবারগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। ফলে নারীরা সব দিক থেকে এখনো স্বাধীনতা পাচ্ছে না। (হিলু, ২০২১)

এক্ষেত্রে তিনি ধর্মীয় বাধা-নিষেধকে বড় করে দেখেছেন। যার ফলে নারীরা শিল্পচর্চায় এখনো বৃহদাংশ হয়ে উঠতে পারছে না। শাহাদাৎ হোসেন খান হিলু সমাজের নানাবিধ ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাবের কথা বলেছেন কিন্তু দলে এই প্রভাব না থাকলে দলের পরিচালনা পরিষদ এবং নারী সদস্যের দলের প্রতি অনাগ্রহ শঙ্কার জন্ম দেয়।

মহুয়ার এত আত্মত্যাগের পরেও কেন পালার ইতি নইদার চাদের কথা দিয়ে শেষ হলো? পুরো পালাকে নইদার চাদের আখ্যান কেনো বলা হলো বলে আপনি মনে করেন? এ ব্যাপারে আপনাদের পরিবেশনায় কোনো পরিবর্তন আছে কি বা পরিবর্তন আনার কোন ইচ্ছা আছে কি? তিনি বলেন,

> দেখুন, দর্শক একটা কাহিনির উপস্থাপন দেখতে চায়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখতে চায় না। দর্শক হাসতে চায় নয়তো কাঁদতে চায়। সংলাপে সুসজ্জিত সুগঠিত কাহিনি শুনতে চাই। সুতরাং আমরা বিশ্লেষণাত্মক জায়গায় না গিয়ে গীতিকারের কোনো পরিবর্তন করি নি। (হিলু, ২০২১)

এখন যদি আপনি মহুয়া পুনঃউপস্থাপন করেন তবে কি শেষ দৃশ্যের কোন পরিবর্তন আনতে চান? হিলু বলেন,

> একটি চরিত্রকে আমরা নানাভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে চাই ভাঙতে চাই কিন্তু পাশাপাশি আমাদের ভাবতে হয় যে দর্শক কী চায় বা তারা কিভাবে নেবে। এত ভাবার সময় তো তাদের নেই। সুতরাং সেই ভাবনা মাথায় রেখে আমাদের নাটক করতে হয়। (হিলু, ২০২১)

তাহলে শিল্পের দায়বদ্ধতা কোথায়? দর্শককের মনন সৃজন তো শিল্পীর দায়িত্বের অংশ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> এটা আমরা কথায় বলছি কিন্তু চর্চায় রাখছি না। কারণ আমাকে তো আমার সমাজব্যবস্থায় শিল্পচর্চা করতে হচ্ছে। কিছু সীমাবদ্ধতা তো আছে। সুতরাং আমাদের সমাজ কাঠামোয় আমরা চাইলেই আমাদের ইচ্ছেমত সব কিছু প্রকাশ করতে পারছি না। যা ইউরোপ আমেরিকাতে খুব সহজ তা আমাদের অবস্থানে প্রকাশ করা একটু কঠিন। আমাদের এই সমাজবাস্তবতায়ও শিল্পীর দায়িত্ব অবশ্যই আছে এবং সেটাকে খুঁজে বের করে সেই মতো আমাদের কাজ করা প্রয়োজন আমাদের সমাজের মানসিকতা উন্নত করার জন্য। (হিলু, ২০২১)

শিল্পীর কী তবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা নেই! থিয়েটার নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের এই মনোভাব প্রশ্নের জন্ম দেয়।

শিল্পীর দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে ফ্রাঞ্জ ফেনোর মত,

> বুদ্ধিজীবীগণ যে সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়েন, তা প্রায়শই খোলস নিয়ে মাতামাতি বৈ কিছু নয়। তিনি নিজেকে জনগণেরে মাঝে সম্পৃক্ত করতে চান; কিন্তু তিনি আঁকড়ে থাকেন তাদের বহিরাবরণ। নিভৃতে বয়ে চলেছে যে জীবন। যে জীবন প্রাচুর্যময় আর সর্বদা গতিশীল, তারই ছায়া শুধু এই বহিরাবরণ। গণ মানুষের এই চরম অবধারিত নিঃস্পৃহতা দেখে মনে হয় এটাই তাদের চরিত্র; কিন্তু আসলে যে মৌলিক সারবস্তু তাদের প্রাণ, যা প্রতিনিয়ত বদলে চলেছে তা উপেক্ষিত হয়। (ফেনো, ১৯৮৮)

ময়মনসিংহ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (মাফা)

সারওয়ার জাহান *মহুয়া* প্রযোজনায় সংলাপ রচনা ও গ্রন্থকার এবং সংলাপ উচ্চারণে কাজ করেছেন। তিনি বয়াতি, সুজন ও বেদে সর্দার হোমরা চরিত্রেও অভিনয় করেন। এছাড়াও রয়েছেন নাজমুল হক লেলিন যিনি নদের চাদ চরিত্রে একশোরও বেশি প্রযোজনায় অভিনয় করেছেন। রয়েছেন অমিত হাসান শিবলু, তিনি সুজন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। হামিদুর রহমান

সওদাগর চরিত্রে, নশিন আনবার তোয়া পালং সই চরিত্রে এবং আয়েশা সিদ্দিকা তাসনিম সখী চরিত্রে অভিনয় করেন।

আপনারা কোন সংগঠনের হয়ে *মহুয়া* পরিবেশন করেছেন?

সারওয়ার বলেন,

> জেলা শিল্পকলা একাডেমী এই ব্যানারটা আমরা ব্যবহার করি যখন সরকারিভাবে কোনো প্রোগ্রাম হয় আর যখন বেসরকারিভাবে কোন প্রোগ্রাম হয় এই টিমটাই আমরা 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' ময়মনসিংহ এই ব্যানারে নিয়ে আসি। (জাহান, ২০২১)

এখন পর্যন্ত কতগুলো পরিবেশনা হয়েছে?

"আমাদের সব মিলিয়ে আড়াইশো থেকে তিনশোর মাঝামাঝি এরকম শো হয়েছে।" (জাহান, ২০২১)

মাফাতে আপনাদের সদস্য সংখ্যা কতজন?

সারওয়ার বলেন, "এখানে আমাদের সদস্য সংখ্যা ষাটোর্ধ। আমাদের দলে মেয়ে ৪০ জন ছেলে কম।" (জাহান, ২০২১)

এতটা পার্থক্য হওয়ার কারণ কি? এই প্রশ্নের জবাবে সারওয়ার সাহেব বলেন,

> আসলে নাচ বলতে তো ছেলে মানুষ কখনো নাচতে চায় না। ছেলে মানুষ নাচলে তাকে সমাজে কটু কথা শুনতে হয়, সমাজে ধিক্কার পায়, সে পরিবারকে একঘরে করে দেয়া হয়। সাধারণত মেয়েরাই নাচের ক্ষেত্রে একটু বেশি থাকে, তাই এটা হয়ে গেছে। (জাহান, ২০২১)

নাট্যদলের তুলনায় নাচের দলে নারী শিল্পীর সংখ্যা বেশি। সুতরাং শিল্প- সংস্কৃতিতে শুধুমাত্র ধর্মের কারণে নারীর অংশগ্রহণের প্রবণতা কম এ ধারণার যুক্তিতে টেকে না।

মহুয়া পালা ছাড়া আপনাদের আর কতগুলো প্রযোজনা আছে?

> আমাদের অনেকগুলি dance-drama আছে যেমন আমাদের সোনাই মাধব আছে, সাগরকন্যার জন্মোৎসব, ময়মনসিংহের বিয়া, রাখালবন্ধু, রাখালিয়ার বাঁশি, নজরুলের

উপরে আছে যদি আর বাঁশি না বাজে। এরকম প্রায় ১৫ টার মত ডান্সড্রামা আমাদের সংগঠন করে। (জাহান, ২০২১)

আপনাদের সংগঠনের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে কবে?

সারওয়ার সাহেব বলেন,

আমাদের ময়মনসিংহ 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' ২০০৯ থেকে যাত্রা শুরু কিন্তু আমরা এই টিমটাই নৃত্যজগৎ নামে একটা ব্যানারে আগে থেকেই কাজ করতাম *মহুয়া* পালা নিয়ে। নৃত্য যতন, নৃত্যজগৎ এরকম ব্যানার গুলোতে আমরা *মহুয়া* পালা করেছি আগে। (জাহান, ২০২১)

মহুয়া পালা ইতিমধ্যে আত্মস্বীকৃত এবং শ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে সেই জায়গা থেকেই কি মহুয়াকে করছেন নাকি মহুয়াকে নেয়ার পেছনে অন্য কোন চিন্তা ছিল বা উদ্দেশ্য ছিল?

সারওয়ার সাহেব বলেন,

উদ্দেশ্য একটাই যে আমরা চাই আমরা সবসময় বিশ্বাস করি যে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আমাদের জাতিগত উত্তরণের হাতিয়ার হোক; এই উপলব্ধি থেকেই আমরা নিজস্ব সম্পত্তি নিজেদের ঐতিহ্য উপস্থাপনের জন্য শুধু *মহুয়া* না আরো অনেক গুলোই করেছি যেমন, *মলুয়া* ও *চন্দ্রাবতী* এগুলি, কিন্তু আমরা দেখেছি *মহুয়ার* যে আবেদন, একটা চিরন্তন প্রেম, এটার যে রূপ সেটা মানুষকে অনেক বেশি টানে। এটার শাশ্বত যে প্রেম, এইটাই হচ্ছে আমাদের মুখ্য বিষয় ছিলো। আসলে তো আমরা সবাই প্রেমটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। কাজেই এই জিনিসটাই এবং এটার ট্রাজিক একটা রূপ আছে যেটা আমাদেরকে খুব বেশি আকর্ষণ করেছে অর্থাৎ মহুয়ার ভেতরে আমরা যদি সাদা চোখে খুঁজতে চাই, প্রেমটা হল মুখ্য তারপরে হলো বৈচিত্রতা তারপরে হলো এটার নাটকীয়তা বা ডাইমেনশন, যেমন একটা জমিদার ও একটা বেদেনীর প্রেম। মেনে নেয়া না নেয়া এটাও তো একটা ম্যাসেজ। প্রেম তো আর স্থান- কাল- পাত্র মানে না। এই মেসেজটা, এটাও মূখ্য ব্যাপার যে ভালবাসার জয় হোক শ্রেণিবৈষম্য না থাকুক। আমরা যারা শিল্পচর্চা করছি তাদের নাটকের মাধ্যমে একটা ম্যাসেজ দেওয়ার ব্যাপার থাকে তো! এটা আমাদের ম্যাসেজ দেওয়ার একটা মাধ্যম এবং যেহেতু এটা দর্শকনন্দিত তাই এই কাজের ভেতর দিয়ে হেঁটেছি। (জাহান, ২০২১)

আমরা কি একটু শুনতে পারি যে আপনারা আপনাদের প্রযোজনায় বন্দনাগীতি কিভাবে ব্যবহার করছেন?

এখন যেটাকে আমরা *মহুয়া* পালা বলি এটা শুরুর দিকে কিন্তু এই নামে ছিল না। একদম শুরুর দিকে যখন দেখি তখন ছিল এটা *মেওয়া চান্দের* পালা পরবর্তীতে এই নামকরণের

> পরেই এই কাহিনিটাই *নইদ্যার চান্দের পালা* নামে, কোন কোন অঞ্চলে আবার *হোমরা বাইদার পালা*, আবার কোথাও *ওনরা বাইদার পালা* নামেও পরিবেশিত হয়েছে। শুরুতেই এটার নাম কিন্তু আর *মহুয়া* ছিল না। (জাহান, ২০২১)

আমরা যখন দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পাণ্ডুলিপির *মহুয়া* পালার পুরো বন্দনায় কোনো নারী দেবীকে বন্দনা করতে দেখি না, আবার আপনাদের প্রযোজনার নামও মহুয়া। তো সেটা কি আপনাদের পরিবেশনায় কোন পরিবর্তন এনেছেন? সারওয়ার সাহেব বলেন,

> আসলে এটা তো আমাদের নেত্রকোনা অঞ্চলের প্রচলিত একটা কাহিনি। আমার মনে হয় যে এক্ষেত্রে ওইখানে যখন এই মহুয়া গীত হতো তখন এই বন্দনা গুলো একেক জন বয়াতি তার মতো করে নিয়ে আসত। যেমন অধ্যাপক সুধীর দাস এই বিষয়টিকে তার মতো করে নিয়ে মূল কাহিনিতে আনে। আমার মনে হয় যেহেতু এইখানে হিন্দু কোন দেবদেবীকে বন্দনা করা হয় নাই আমরা যখন সন্দেহ করি যে হিন্দু গায়েন বা বয়াতি নয় মুসলিমের মুখে এটার চর্চা বেশি ছিল বলেই সংগ্রহের সময় এই বিষয়গুলো ওইভাবে আসছে। মানে মুসলিম নামগুলো বেশি আসছে বলে আমার মনে হয়। (জাহান, ২০২১)

তাহলে চাদ সওদাগর এখানে কেনো আসলো, যেখানে মনসা আসলো না?

সারওয়ার সাহেব বলেন,

> এত মুসলিম লোকেদের বন্দনা করার মধ্যে হঠাৎ করে একজন হিন্দু মানুষকে নিয়ে এসেছে, এটা কেউ হয়তো বেশি একটা খেয়াল করে নি বলে আমার মনে হয়। ওই ধর্মীয় বিষয়টাকে মূখ্য হিসেবে না করে সে আসলে সার্বজনীনতার জন্য, অবচেতনভাবে, অথবা এমনও হতে পারে ছন্দ মেলাতে গিয়ে অনেক সময় এগুলো চলে এসেছে। যা আমরা পরিবর্তন করি নি। যা আছে তাই করেছি। (জাহান, ২০২১)

আপনারা বাংলাদেশের সংস্কৃতি উপস্থাপন করার কথা বলছেন সেক্ষেত্রে পোশাক এবং সেট কি ধরণের রেখেছেন?

সারোয়ার বলেন,

> আসলে এখানে সাজেস্টিভ সেট মহুয়ার আবেদনকে বিঘ্নিত করে, বিকৃত করে তাই আমরা এখানে রিয়েলিস্টিক সেট ব্যবহার করার চেষ্টা করি যেমন নদী কদমগাছ ইত্যাদি। আমরা চাই রিয়েলস্টিক সেট যদিও আমরা কয়েকটা ডিজিটাল প্রজেক্টরের মাধ্যমে ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরি করেছি, কিন্তু সেইটা যতই কথা বলা হোক না কেনো এই সেট ডিজাইনে রিয়েলিস্টিক ব্যাপার আসতেই হবে। সাজেস্টিভ ব্যাপারে ওই বিষয়টা আসে না বা আসবে না। (জাহান, ২০২১)

থিয়েটারে প্রচলিত রিয়েলিজম এবং মাফা'র প্রযোজনা *মহুয়া*র রিয়েলিজম আখ্যা দেওয়া বিপরীতমুখী। মূলত অধিকাংশ ক্ষেত্রে শূন্য মঞ্চ (empty space) কখনো সাজেস্টিভ মঞ্চসজ্জা পরিলক্ষিত হয়।

পালায় *মহুয়া* চরিত্রটাকে আপনারা যখন মঞ্চে রূপায়ণ করেন তখন মহুয়াকে কিভাবে বিশ্লেষণ করেন বা দেখেন?

নাজমুল হক লেলিন বলেন,

> মহুয়া একদম বুদ্ধিমতী একজন মেয়ে। তার বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের জন্য সে নদীতে, বনেসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে নদের চাদকে সেভ করে নিয়ে আসছে। তার মানে মহুয়া খুব বুদ্ধি করে সবকিছু ম্যানেজ করে। মহুয়া নারী হিসেবে খুব বুদ্ধিমতি। (লেলিন, ২০২১)

মহুয়া জানে যে তার বাবা তাকে চুরি করে নিয়ে এসেছে যা সে নিজেই বলে। এখন যে মেয়েটার অর্থ উপার্জন করার ক্ষমতা আছে, যে মেয়েটা দক্ষ বা সক্ষমতা রয়েছে, যে মেয়েটা বাইরে একা বেরোতে পারে, নদীর ঘাটে একা যেতে পারে মানে সে স্বাধীন অনেক জায়গায়, কিন্তু সে তার বাবাকে বলতে পারে না যে, সে তার প্রতি অন্যায় করেছে। সে কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না। এই বিষয়ে পালং সই তাকে কি কোনো সহযোগিতা করতে পারে নাকি পুরুষতন্ত্র যেভাবে একটা মেয়েকে দমন করে পালংও তাই করে?

এ ব্যাপারে পালং সই চরিত্রের অভিনেত্রী নশিন আনবার তোয়া বলেন, "সে মহুয়াকে উৎসাহ দিচ্ছে যে, না তুমি যেটা করছ সেটাই ঠিক, তুমি পালিয়ে যাও। তোমরা দুজন একসাথে থাকো। সহযোগিতা করছে।" (তোয়া, ২০২১) এ প্রসঙ্গে জনাব লেলিন বলেন, "পালং সহযোগিতা করত বিধায় তারা পালিয়ে যেতে পেরেছিল।" (লেলিন, ২০২১) সারোয়ার জাহান এ প্রসঙ্গে আরো যুক্ত করেন,

> আমরা আমাদের গ্রন্থে দেখিয়েছি পালং মহুয়ার থেকে বয়সে বড় ছিল যদিও তারা একত্রে থাকার কারণে একেবারে বান্ধবী পর্যায়ে চলে গেছিল। তারা পরস্পরের ভালো- মন্দ সুখ-দুঃখ শেয়ার করত এবং মহুয়া প্রথম যখন নদের চাদের প্রেমে পড়ে এটা পালং- এর কাছেই কিন্তু সে তার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে যে আমি প্রেমে পড়েছি। আমি তারে না পাইলে ছুরি দিব আমার বুকে, ইত্যাদি। এ ব্যাপারে পালং তাকে আশ্বস্ত করে যে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। পালং বলে, আমরা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের নিয়মে তোদেরকে খুঁজতে বেরোবো। যদি এই রকম কোনো ঘটনা কখনো ঘটে তাহলে এই বিশেষ বাঁশিটা আমি বাজাবো। একটা সংকেত আমি তোকে দেবো তখন তুই বুঝবি যে আমরা কাছে চলে আসছি, ঘেরাও দিচ্ছি। তখন আত্মরক্ষার জন্য তুমি তোমার রাস্তা বেছে নিও। এমনকি বাস্তবেও যখন মহুয়া নদের চাদকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে বাস করে এবং তাদেরকে যখন খোঁজা হচ্ছে তখন ঘুমন্ত অবস্থায়। ঘুম ভাঙ্গে অতীতের দেওয়া কথার ওই নির্দিষ্ট বাঁশির সুরে। কাজেই এ ক্ষেত্রে বোঝা যায় যে, পালং সই আসলে তাদের প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি ছিল। (জাহান, ২০২১)

মহুয়া পাণ্ডুলিপি এবং প্রযোজনায় পালং সই- এর ভূমিকার পার্থক্য দেখা যায়। *মহুয়া* পালার পুরোটা জুড়েই আমরা নারীকেন্দ্রিক গতি- প্রকৃতিতে মহুয়ার অনেক আত্মত্যাগ দেখতে পাচ্ছি....প্রশ্ন শেষ না হতেই সারোয়ার জাহান বলে ওঠেন,

> মহুয়ার থেকে নদের চাদের সেক্রিফাইস বেশি। এটা মনে করছি কারন, সম্যক দৃষ্টিতে যেহেতু সে একটা জমিদার, প্রাচুর্যতা তাকে আকর্ষণ করতে পারে নাই। কিন্তু অন্যদিকে জেনেটিক্যালি যদি আমরা চিন্তা করি যে মহুয়া বেদেদের কেউ না সুতরাং বেদে সমাজের যুক্তিসিদ্ধ চালচলন এইটা তাকে বেশি আকৃষ্ট করবে এটাই স্বাভাবিক। সেটা মুসলিম বা হিন্দু যাই হোক না কেন জেনেটিক্যাল একটা ব্যাপার স্যাপার আছে কিন্তু মহুয়ার প্রেমে জমিদারি ছাড়লো নদের চাদ। তবে অবশ্যই মহুয়ার সেক্রিফাইস আরেকটা আছে, যখন সুজন মহুয়াকে বলল নদের চাদকে হত্যা করতে তখন মহুয়া চাইলে নিজে আত্মহত্যা না করে নদের চাদকে মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু সে করে নি। এটা তার একটা সেক্রিফাইস হতে পারে। (জাহান, ২০২১)

আপনার কি মনে হয় না যে অল্প বয়সী একজন মেয়েকে দেখে নদের চাদের মহুয়ার প্রতি একটা মোহ কাজ করে?

সারোয়ার জাহান বলেন,

> আসলে আমরা যখন প্রেমে পড়ি তখন তো আমরা প্রথমত রূপ দেখে বেশি আকৃষ্ট হই তারপর আসি গুণবিচারে। যে মুখ দেখে গোরু হুইত্যা পড়তেছে সেখানে নদের চাদও হুইত্যা পড়ব এইটাই তো স্বাভাবিক। আশি বছরের বুড়া যেখানে পাগল হয়ে যায় সেখানে নইদার চাদ তো হবেই। (জাহান, ২০২১)

নদের চাদকে নিয়ে মহুয়া পালিয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘ একটা সময় নদের চাদ মহুয়ার পাশে ছিলো না। মহুয়া প্রথমে নৌকায়, পরবর্তীতে বনে সন্ন্যাসী থেকে নিজের জীবন ও আত্মমর্যাদা রক্ষায় লড়াই করে। তবুও সে ফিরে যায় না। সে তার প্রেমকে রক্ষার জন্য যতটা বিপদ সংকুল পথ অতিক্রম করে এবং পুনঃরায় যখন তার হাতে ছুরি তুলে নিতে বাধ্য করা হয় তখনও সে নিজেকেই উৎসর্গ করে। নিজের জীবন বাঁচাতে প্রেমিককেও মারতে পারত! এটা ভাবার পর আপনার কী মনে হচ্ছে, সেক্রিফাইসের জায়গাটা কার বেশি? সারওয়ারের মতে,

> বিয়ে করার পর একটা ছেলে আর একটা মেয়ের মধ্যে শুধু প্রেমটাই থাকে না বরং সময়ের সাথে সাথে তাদের যে লেনা- দেনা, এবং একজন আরেকজনের উপর যে আস্থা সেটার উপর ভিত্তি করে দায়িত্বের পাশাপাশি প্রেমটাও কাজ করে। মহুয়া আর নদের চাদকেও যদি আমরা ঐভাবে ভাবি, তাদের গতানুগতিক প্রথায় বিয়ে না হলেও তাদের ভিতর একটা আত্মিক বিয়ে হয়ে গেছে। সেই ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেও প্রেমটা তো জেগে ওঠে। সুতরাং মহুয়া হয়তো আবেগের বশবর্তী হয়ে ওইটাকে বড় করে দেখে নিজের বুকেই ছুরি চালিয়ে দেয়। (জাহান, ২০২১)

তাহলে কি আমরা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রেমের দায় অধিকাংশ নারীর উপর চাপিয়ে দেই?

সারোয়ার বলেন, "(ক্ষণকাল নীরবতা) নিঃসন্দেহে! এই প্রেম করা প্রেমকে যত্ন করা, শুশ্রূষা দেয়া এগুলোর দায়িত্ব পুরুষের চেয়ে নারীরই বেশি। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তো আমরা তাই মনে করি।" (জাহান, ২০২১)

হোমরা তার পিতা না হয়েও তার উপর অন্যায় করছে সে কোন প্রতিবাদ করতে পারছে না। এমনকি শেষ দৃশ্যেও তার হাতে তুলে দেয়া ছুরি সে হোমরা বা নদের চাদের দিকে না দিয়ে নিজের বুকেই মারছে, নারীর হীনমন্যতা নারী অধিকারের অন্তরায় বলা যেতে পারে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এর উদাহরণ অহরহ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

> বিয়ের সালিশ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সুলতানা কামাল বলেন, এমনো পরিস্থিতির উদাহরণ আছে, যেখানে ফাঁসির নিচে কোনো শাস্তিই মানতে রাজি নন অভিযোগকারিণী, কিন্তু পরদিনই মামলা তুলে নেয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি। দিনের পর দিন ধরে নানান অজুহাতে সম্পূর্ণ সম্পত্তি গ্রাস করায় নিঃশব্দ হয়ে যাওয়ার পরেও 'সংসার করার' আকাংখ্যা! যতই কষ্ট দিক না কেন তারপরেও সম্পর্ক আঁকড়ে থাকার সিদ্ধান্ত! প্রচণ্ড কষ্টের উপার্জনের শেষ মুদ্রাটাও নিয়ে যাক, তারপরেও তিনিই 'স্বামী'! অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিয়ের আগে মদনের তীরটি পুরুষের বক্ষে যত তীব্র আঘাতই হানুক না কেন- বিয়ের পরে তীরের আঘাতের যন্ত্রণা যেন বহন করতে হয় নারীকেই। (কামাল, ২০১০, পৃ: ১০৬)

নারী শেষ পর্যন্ত আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। সামাজিক মূল্যবোধ নারীকে হেজিমোনাইজ করে তোলে। এই সামাজিকীকরণের ফলে নারীর হীনমন্যতা তাদের স্বমহীমায় আত্মপ্রকাশের প্রতিবন্ধকতায় রূপ লাভ করে।

মহুয়া নিজের আত্মহননের মাধ্যমে যে পরিসমাপ্তি নিয়ে আসে তা কি তার আত্মসমর্পণ? সারোয়ার জাহান বলেন,

> আমি অত ডিটেইলসে যাবো না। আমরা যে মহুয়া করি সেখানে তার এই আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা আমরা এইভাবে উপস্থাপন করি না। তারা গভীর বনে দুজনে বাস করতে থাকে। সেখানে হোমরা যখন মহুয়ার হাতে ছুরি তুলে দেয় তখন মহুয়া গিয়ে হোমরাকে অনুরোধ করে। পালং সই এমনকি নদের চাদও বলে যে, আমি লাগলে বেদে হয়ে তোমার দলের সাথেই থাকব তবু তুমি আমাদের রাখো (মেরো না)। এমনটা আমাদের গ্রন্থনায় আমরা উপস্থাপন করি। (জাহান, ২০২১)

নাটকে হোমরাকে তার ভুল বোঝানোর জন্য মহুয়ার মৃত্যুটা দরকার ছিলো বলে আপনারা মনে করেন?

সারোয়ার জাহান বলেন, "হ্যাঁ, তার মৃত্যুটা দরকার ছিল। তবে মৃত্যুর আগে কখনো কখনো মহুয়ার প্রতি হোমরার স্নেহ জেগেছে কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার দ্বিধান্বিত হয়ে গেছে যে আমার দল টিকাইতে অইবো।" (জাহান, ২০২১)

আপনাদের প্রযোজনাটি শেষ হয় কোন সংলাপ দিয়ে? সারোয়ার সাহেব বলেন যে,

> হায় আল্লাহ্ এইডা আমি কি করলাম কি করলাম। লাষ্টে বয়াতির কথা আমাদেরও আছে কিন্তু আমরা করেছি কি লাষ্টে বয়াতি ঢুকেই যে ন্যারাশনটা সেটা আমরা কেটে দিয়েছি। এই খানেতে শেষ হইল মহুয়ারও গান। তারা এটাকে মহুয়ার গানই বলছেন। তবে শেষটা তারা করেন হোমরার আহাজারির মাধ্যমে বয়াতি যেখানে মঞ্চে ঢুকে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। (জাহান, ২০২১)

সর্বোপরি বোঝা যায়, মাফার প্রযোজনায় গ্রন্থকার দীনেশচন্দ্র সেন এবং সুকুমার সেনের সংগৃহীত পালা থেকে অনেক কিছু পরিবর্তন করে গ্রন্থনা করেছেন। যেমন, পালং সইকে মহুয়ার প্রেমে সহায়ক ভূমিকায় দেখান এবং নদের চাদকে দিয়ে হোমরার কাছে মিনতি করান যা অন্যান্য সংগঠনের পালার থেকে অনেকাংশে ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মহুয়া কেনো প্রতিবাদ করতে পারল না- এ প্রসঙ্গে প্রায় সবাই বলছেন যে চাইলেই সব করা যায় না। পারিপার্শ্বিকতা বলে একটা কথা আছে যা আমাদের অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। আমাদের কথা বলার জন্য সমাজকে পরিবর্তিত হতে হবে। তারা পরিবর্তনের প্রত্যাশা করছেন কিন্তু পরিবর্তন করার লক্ষ্যে সাংগঠনিকভাবে কোনো ভূমিকা রাখছেন না। *মহুয়া* যে সংস্কৃতির সীমায় আবদ্ধ তারাও সেই একই সমাজের আবহে *মহুয়ার* প্রতিরূপায়ণ করছেন অর্থ্যাৎ *মহুয়া*'র সাথে তাদের চিন্তার কোন পার্থক্য তৈরী হচ্ছে না। মহুয়ার মত তারাও নিজেদের পারিপার্শ্বিকতাকে নিজের ভাগ্য বলে মেনে নিচ্ছে। ফলে খুব সাবলীলভাবে শিল্পের দায়িত্ব বর্তমান শিল্পীদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। অপারগতার দায় নিজের ভাগ্যের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

প্রত্যেকটা গ্রুপের ধারণকৃত যে ভিডিওগুলো আমরা সংগৃহ করতে পেরেছি সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, তারা যা দেখিয়েছে আর যা বলেছে তা অনেকাংশে ভিন্ন। আঙ্গিক নির্বাচন, আলোকসজ্জা, পোশাক, সংগীত ও আবহ, এবং সেটসহ

অন্যান্য পরিকল্পনায় তারা বাস্তববাদী চিন্তা করেছেন বললেও তা মূলত 'স্টাইলাইজড' পরিবেশনা। পরিবেশনায় ধারণকৃত সংগীত, সংলাপে নৃত্যের ভঙ্গিমা, মঞ্চের পেছনে অনুষ্ঠান আয়োজকদের নিজস্ব ব্যানারের উপস্থিতি, গান ও দৃশ্যে আলোর বিক্ষিপ্ত ব্যবহার সব মিলিয়ে বাস্তববাদী চিন্তার পরিবর্তে স্টাইলাইজরীতির উপস্থিতি লক্ষণীয় হয়।

উদীচীর নারী চরিত্রের অভিনেত্রী ফাহমিদা ইয়াসমিন রুনা যে কথাটা বলতে চেয়েছিলেন,

> আমরা আমাদের সময়ে যতটা ভেবেছি এই সময় আমার মেয়ে তার থেকেও আধুনিক ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। আমার মেয়ে আমার থেকেও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ভাবতে পারছে। কিন্তু যখন দেখছি যে মেয়ে আমাকে ছাড়িয়ে ভাবছে এবং সে তার সময় অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে চাইছে তখন আমি নিজের মেয়েকে বাধা দিচ্ছি। কী করতে হবে এবং কীভাবে করবে তা বলে দিচ্ছি। মেয়ের ভাবনা আমাদের সমাজের প্রেক্ষিতে ঠিক নয় বলে নিজের মেয়ের ভাবনাকে আমি মোডিফাই করার চেষ্টা করছি। (ইয়াসমিন, ২০২১)

ফাহমিদা ইয়াসমিনের আলোচনার প্রেক্ষিতে সমাজে পুরুষতন্ত্রের হাতিয়ার হিসেবে নারীকেই নারীর বিপরীতে ব্যবহার হতে দেখা যায়। "আধিপত্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিবারের ভূমিকা অন্যতম, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীকে বৈধ নাগরিকত্ব দেওয়া হলেও নিয়ন্ত্রণ করা হয় পরিবারের মধ্যে দিয়ে"। (Millett, 1969)

পরিবারের নারী সদস্যসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীরাই পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতাকাঠামোকে বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, আচরণ সকল দিকেই সপরিবারের নারী অথবা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই নারীরা নিজেদের ক্ষমতা পরিসর তৈরি ও অক্ষুন্ন রাখতে চায়।

মাফার পালং সই চরিত্রের অভিনেত্রী তোয়া প্রশ্নের জবাবে উত্তর দেবার সময় তার সামনে তার বাবা, দলের সভাপতিসহ অন্যান্য পুরুষ অভিনেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাদের সামনে তার কথা বলার ভঙ্গিমা ও আওয়াজ থেকে তার আভ্যন্তরীণ সংকোচ স্পষ্টই ধরা পড়ছিল। সে তার নিজের কথাগুলো বোঝাতে পারছে না বা তার কথার পক্ষ নিয়ে সে আত্মবিশ্বাসী নয়। কথার মাঝখানে হঠাৎ তার বাবা তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এসে কথা বলতে শুরু করেন। কারণ, তিনি এখনো বয়সে ছোট। মাত্র দশম শ্রেণিতে পড়ে। সুতরাং তোয়ার কথা টেনে নিয়ে পুরুষ সদস্যরা বারবার কথা

বলছিল। তার কথা বলার প্রবণতাকে তার বাবাসহ অন্যান্যরা বাধাগ্রস্থ করছিল, কিন্তু শেষের দিকে মহুয়ার মৃত্যু প্রসঙ্গে এসে তোয়া বলছে "মহুয়ার মত সবাই স্বাধীন হতে চায়।" (তোয়া, ২০২১) অর্থাৎ সে তার অবচেতনে এখনও পর্যন্ত পরাধীন রয়ে গেছে। আমাদের সমাজ নারীদের জন্য এখনও পুরোটা সাবলীল হয়ে ওঠে নি। এই সময়ে এসেও মহুয়া নিয়ে কাজ করে, বিশ্লেষণ করে মহুয়ার সীমাবদ্ধতাগুলো জানার পরও তোয়া অনুভব করছে আমাদের স্বাধীনতা প্রয়োজন, স্বাধীন হওয়া প্রয়োজন। নাট্যপ্রযোজনার অভিজ্ঞতা ব্যক্তি জীবনে কাঙ্ক্ষিত প্রভাব রাখছে কি! এখনো আমরা কামনাই করছি। নারীরা এখনো মহুয়ার মত মুক্তিলাভ করতে চাইছে। মেয়েরা ঘরের বাইরে বের হচ্ছে, নিজের পছন্দ মত কাজ করছে, নিজের পছন্দ মত জীবনসঙ্গী বেছে নিচ্ছে, তারপরও তারা ভেতরে এখনো পরাধীনতা বোধ করে। পরাধীনতার কারণ হলো এখনো আমাদের আভ্যন্তরীণ আত্মবিশ্বাসের দূর্বলতা। পুরুষের কর্মদক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং দৃঢ় কণ্ঠে দিকনির্দেশনা দেওয়ার সামর্থ্য নারীদের দমিয়ে রাখে। নারীরা পুরুষদের ছাপিয়ে যেতে পারে না বলে তাদেরকেই কর্তা বলে মনে করি।

নাট্যের ভেতরে নারীর অবস্থান এবং এই সময়ে নারী হিসেবে নারীর অবস্থান একই। সময়ের পরিক্রমায় সবকিছুই পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু নারীর প্রতি সহিংসতার সেই প্রাচীন রূপ নতুনরূপে একবিংশ শতকেও বিদ্যমান। নারীকে অবদমনের প্রচেষ্টা এখনো সমাজ দর্শনে প্রোথিত আছে। মহুয়া তার সময়ে দাঁড়িয়ে কোনো প্রতিবাদ করে নি বলে তার অবস্থার পরিবর্তন হয় নি কিন্তু বর্তমান সমাজে নারী কথা বলেও নিজের অবস্থার কোন পরিবর্তন আনতে পারছে না। আমরা ব্যক্তির সমালোচনা করছি, আন্দোলন হচ্ছে, সেমিনার হচ্ছে, লেখালেখি হচ্ছে কিন্তু তারপরও সমাজের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থাৎ নারী তার খোলস বদলালেও তার কাঙ্খিত অবস্থায় এখনো পৌঁছাতে পারে নি, কারণ নারী এখনো রুচি অনুযায়ী নিজেকে সাজাতে পছন্দ করে। নারীর কাছে পুরুষের প্রত্যাশার ধারাবাহিকতায় কোন বাঁধা পড়ছে না। ফলে নারীর প্রতি পুরুষের চিন্তার বাহ্যিক পরিবর্তনকে প্রায়োগিক রূপ দেয়া সহজ নয়।

পরিবেশনার সংকেতসমূহ ব্যাখ্যা এবং পরিবেশনায় অংশগ্রহণকারীদের আলোচনার মাধ্যমে পরিবেশনার দর্শনগত উপলব্ধি প্রকাশিত হয়। মহুয়া নাট্যসাহিত্য উপস্থাপন পর্যায়ে এসে বর্তমান সমাজ দর্শনের সাথে সমন্বয়, কিছু ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়ে বিশ্লেষিত হয়। নির্দেশক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, এবং সংশ্লিষ্ট সকলের দর্শনগত মিথস্ক্রিয়ার ফল স্বরূপ এই বিশ্লেষণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মহুয়া উপস্থাপনে তিনটি দলের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সমাজ দর্শনের বহিঃপ্রকাশ। কোথাও পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনের বিপরীতে পাণ্ডুলিপির ব্যাখ্যামূলক পরিবর্তন সাধন করে উপস্থাপন হতে দেখা গিয়েছে।

আবার ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষতন্ত্রের গুরুত্ব বাড়াতে পালাটির নাম পরিবর্তন করেও মঞ্চায়িত হবার খবর পাওয়া গেছে। পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণের পর পরিবেশনা বিশ্লেষণ কালক্রমে পর্যায়ক্রমিক রূপরেখা অংকনে সহায়তা করেছে। অতীতের অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি রচনা কালের নারী এবং বর্তমান উপস্থাপনা কালের নারী ধারণার মূল পার্থক্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হলেও অন্তর্গত হীনমন্যতা অনেক ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়েছে। সমাজের অর্থনৈতিক বা জীবন যাপনের মানের পরিবর্তন সাধনের পাশাপাশি নারী সম্বন্ধীয় দর্শনগত পরিবর্তন জরুরী। ক্ষেত্র বিশেষে নারী ভাবনার উন্নয়ন সাধন হলেও আরও হাঁটতে হবে অনেক পথ।

গ্রন্থপঞ্জি

Millet, Kate. (1969). Sexual Politics. U.S.A: Doubleday and Co

চক্রবর্তী, তাপস। (২০২১, অক্টোবর ৩০)। গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

তোয়া, নশিন আনবার।(২০২১, অক্টোবর ৩০)। গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

উইকিপিডিয়া। (১৭ আগস্ট ২০১৭)। বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী। সংগৃহীত ১২ নভেম্বর ২০২১। গুগোল: https://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশ_উদীচী_শিল্পী গোষ্ঠী

কর, প্রদীপ চন্দ্র।(২০২১, অক্টোবর ৩০)। গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

রুনা, ফাহমিদা ইয়াসমিন।(২০২১, অক্টোবর ৩০)। গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

লেলিন, নাজমুল হক।(২০২১, অক্টোবর ৩০)। গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

হিলু, শাহাদাত হোসেন খান।(২০২১, অক্টোবর ৩০) গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

রবীন, সারোয়ার কামাল। (২০২১, অক্টোবর ৩০)। গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

জাহান, সারোয়ার ।(২০২১, অক্টোবর ৩০)। গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

ফেনো, ফ্রাঞ্জ। (১৯৮৮)। *জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত,* ইসলাম ভূঁইয়া আমিনুল (বাংলা অনুবাদ)। ঢাকা

কামাল, সুলতানা। (২০১০)। *নারী, মানবাধিকার ও রাজনীতি*। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ। পৃ: ১৮

পঞ্চম অধ্যায়

পাণ্ডুলিপি থেকে প্রযোজনা

পরিবেশনা রীতি

ঐহিত্যবাহি বাংলা নাট্য সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে আসরকেন্দ্রিক যা মূলত ধর্ম সাধনার অংশ ছিলো, কিন্তু মধ্যযুগে এসে সে ধর্ম সাধনার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে পড়ে এই শৈলী। বাংলা নাট্যে শুরু হয় এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। সূচিত হয় নবতর আঙ্গিক নাম- কিচ্ছা গান। এ কিচ্ছা গান পরবর্তীকালে নানারকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে নামাঙ্কিত করে ময়মনসিংহ গীতিকা (মৈমনসিংহ গীতিকা) নামে পরিচিতি লাভ করে। বলাবহুল্য সময়ের বির্বতনে গত শত বছরে নানাবিধ আধুনিকতার ছোঁয়ায় এই গীতিকার পরিবেশনারীতিতে আসে বর্ণিল পরিবর্তন। পরিবেশনায় কৃত্যের তেমন আধিক্য নেই, নেই স্থান কালের ছকে সেই ধ্রুপদী নিয়ম- রীতি পালনের বাধ্যবাধকতা। পরিবেশনায় সে এতোটাই মুক্ত যখন যেখানে যেভাবে চায় করা যায়। মাঠসমীক্ষণে গিয়ে সরাসরি পর্যবেক্ষণ আর মৃত্তিকাসংলগ্ন শিল্পীদের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় গীতিকার পরিবেশনে কিছু কাঠামো নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হয়। অপরদিকে শহরের গ্রুপ থিয়েটারকেন্দ্রিক অথবা সৌখিন নাট্যদলের পরিবেশনায় প্রেক্ষাগৃহে আধুনিক মঞ্চসজ্জা, আলো, পোশাক ও রূপসজ্জার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

নিচে পরিবেশনারীতির কাঠামো উপস্থাপন করা হলো।

মঞ্চসজ্জা

ময়মনসিংহ গীতিকার মঞ্চসজ্জার কোন নিয়ম নেই বললেই চলে। পরিবেশনা উপযোগী যে কোন স্থানে পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে সাধারণত সন্ধ্যার পর গাছের তলায়, বাড়ির উঠান বা বাইডাক (বাড়ির বাহিরের অংশ), উন্মুক্ত আকাশের নিচে সামিয়ানা দিয়ে, কখনো সামিয়ানাবিহীন পরিবেশনা হয়ে থাকে। বর্ষাকালে বাড়ির কাচাড়ি ঘরেও গীতিকা পরিবেশনা করা হতো। বর্তমানে হাটবাজার, স্কুলের উন্মুক্ত স্থানে গীতিকা পরিবেশিত হতে দেখা যায়। গীতিকা পরিবেশনা কালে সব ধরণের মঞ্চ ব্যবহার হতে দেখা যায় তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিন দিক দর্শকবেষ্টিত মঞ্চ পরিলক্ষিত হয়। ময়মনসিংহের উদীচী, বহুরূপী, ময়মনসিংহ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (মাফা) পাশ্চাত্যে প্রসেনিয়াম মঞ্চে তাদের পরিবেশনা করে থাকে।

আলোকসজ্জা

মহুয়া পালা পরিবেশনার জন্য অতিরিক্ত আলোকসজ্জার ব্যবহার হয় না। অতীতে হারিকেন, মশাল ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে হ্যাজাক, বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করা হয়। তবে যদি কোন এলাকায় বৈদ্যুতিক সংযোগ না থাকে তাহলে ব্যাটারি চালিত

আলোর ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় অর্থাৎ ময়মনসিংহের উদীচী, বহুরূপী, ময়মনসিংহ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (মাফা) *মহুয়া* পালার মঞ্চায়নে আধুনিক আলোর ব্যবহার করে।

অভিনয় স্থান

ঐতিহ্যবাহি বাংলা নাট্যধারার প্রায় সকল পরিবেশনার অভিনয় স্থান হিসেবে সাধারণত উন্মুক্ত স্থানকে প্রাধান্য দেয়া হয়। স্থানভেদে বাইডাক (বাড়ির বাহির), হাট-বাজার, স্কুলের মাঠ ইত্যাদি স্থানে পরিবেশনা হতে দেখা যায়। অপরদিকে, শহরকেন্দ্রিক পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, জেলা পরিষদের আয়োজনে লোকজ উৎসবে *মহুয়ার* পালার অভিনয় স্থান ছিলো একদিক দর্শক উপস্থিতমূলক (প্রসেনিয়াম) মঞ্চ।

মহুয়া পালা পরিবেশনায় সাধারণত অভিনয় এবং দর্শক আসন বিন্যাস নিম্নরূপ হয়ে থাকে।

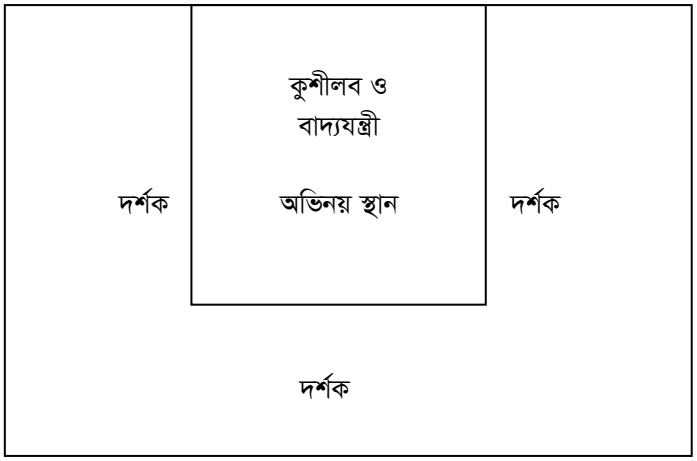

মহুয়া পালার আসর

ময়মনসিংহ শহরকেন্দ্রিক প্রযোজনার মঞ্চ ও দর্শক বিন্যাস

রূপসজ্জা

ময়মনসিংহ গীতিকা *মহুয়া* পালা পরিবেশনার জন্য সাধারণ রূপসজ্জার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ পালাতে সাধারণত মুখে পানি তেল সহযোগে পাউডার ব্যবহার করা হয়। ঠোটে লাল লিপস্টিক, চোখে কাজলের ব্যবহার বেশ লক্ষণীয়। বায়েন দল ও দোহারদের জন্য আলাদা রূপসজ্জার দেখা যায় না তবে কখনো হালকা পাউডার ব্যবহার করে থাকে। পূর্বে পাউডারের পরিবর্তে জিং অক্সাইড ও চোখে কাজলের পরিবর্তে কাঁঠালপাতা দিয়ে তৈরি এক ধরণের বিশেষ কালি ব্যবহার করা হতো। শহরকেন্দ্রিক নাট্য চর্চায় চরিত্র অনুযায়ী যেমন অভিনেতার বৈচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়, তেমনি রূপসজ্জার ক্ষেত্রেও চরিত্র অনুযায়ী মেকাপ বা রূপসজ্জা করতে দেখা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে অতিরঞ্জিত রূপসজ্জা পরিলক্ষিত হয়।

পোশাক পরিকল্পনা

গীতিকা *মহুয়া* পালা পরিবেশনের ক্ষেত্রে পোশাকের তেমন বৈচিত্র্য লক্ষ্যকরা যায় না। সাধারণত এক ধরণের পোশাক-ই সবাই পড়ে থাকে। তবে পোশাক সব সময় জাকজমকপূর্ণ হয়ে থাকে; বিশেষকরে লাল, হলুদ, রং-এর বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। গায়েন আলখাল্লা জাতীয় জামা, পায়জামা, উত্তরীয় পরে থাকে। এর ধরণের পোশাক জারি গানেও (বৈষ্ঠা জারি) ব্যবহার হয়। বলাবাহুল্য দোহার বাদ্যযন্ত্রী একই পোশাক পড়ে থাকে। তবে গায়েনের পোশাকে বিশেষ ধরণের জরির কাজ (ডিজাইন) দেখা যায়।

পর্যবেক্ষণকৃত শহরকেন্দ্রিক পালার পরিবেশনায় অনেক চরিত্রের সমাহারের ফলে চরিত্র অনুযায়ী পোশাক পড়তে দেখা যায়। যেমন নদের চাদ লাল পলিস্টারের কাপড়ের উপর ডিজাইন করা পোশাক, মহুয়া সাধারণ ছাপার শাড়ি এবং হুমরা হাতা কাটা এক ধরণের বিশেষ শার্ট পরিধান করে থাকেন।

অভিনয় উপকরণ

মহুয়া পালা পরিবেশনের সময় সাধারণত পালার গায়েন লাঠি, বালিশ, মালা (অলংকার, মা মাঝে দ্রব্যসম্ভার হিসেবে) ইত্যাদি ব্যবহার করে। বলাবাহুল্য গীতিকা পরিবেশনের সময় একই দ্রব্যের বা পোশাকের বহুমাত্রীক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, যেমন গায়ে যে উত্তরিয় পড়ে থাকে সেটা কখনো বৈঠা হিসেবে ব্যবহার হতে দেখা যায়। পর্যবেক্ষণকৃত পালাতে নানাবিধ বাস্তবধর্মী দ্রব্যসম্ভার ব্যবহার করতে দেখা যায়।

ময়মনসিংহ শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় *মহুয়া* পালাতে লাঠি , ঝুড়ি (সাপ রাখার বিশেষ বাক্স) মালা, ত্রিশুল, লাঠি, সাপের বিন, সাপ ইত্যাদির ব্যবহার বেশ লক্ষ্যকরা যায়।

বাদ্যযন্ত্র

মহুয়া পালাতে ঢোল, হারমোনিয়াম, বাঁশি, করতাল ব্যবহার হতে দেখা যায়। তবে আগে এর সাথে মৃদঙ্গ, খোল, তবলা, মন্দিরা, পাতার বাঁশি ব্যবহৃত হতো।

ময়মনসিংহ শহরে যে *মহুয়া* পরিবেশনা হতে দেখা যায় সেটা স্টুডিওতে রেকডিং করা একটা অডিও ট্রাক; যার উপর পরিবেশনা হতে দেখা যায়। যাতে আধুনিক ও দেশজ সব ধরণের বাদ্য যন্ত্রের বহুমাত্রীক সংযোজন রয়েছে। যেমন, দোতরা, ভায়োলিন অন্যতম।

অভিনয়রীতি

আলোচ্য গবেষণায় বিশ্লেষিত মহুয়া পালাভিনয় সম্পর্কে অনুসন্ধানে গবেষক সাইদুর রহমান লিপন- এর লোকনাট্যের অভিনয় সম্পর্কিত তত্ত্বের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। গবেষকের মতে লোক পালায় ৪ ধরণের অভিনয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১. বর্ণনাত্মক গদ্য
২. বর্ণনাত্মক গীত
৩. সংলাপত্মক অভিনয়
৪. সংলাপাত্মক গীত

১. বর্ণনাত্মক গদ্য

"আখ্যান পরিবেশনায় দুটি পরস্পর দৃশ্য বা ঘটনার মধ্যে সংযোগ সম্পর্ক স্থাপনে বর্ণনাত্মক গদ্যের ব্যবহার দেখা যাবে।" (লিপন, ২০১০, পৃ: ৪৭)। উক্ত অভিনয়শৈলীর মধ্যদিয়ে গায়েন আখ্যানের বিষয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। বর্ণনাত্মক গদ্যাভিনয়ে নানা রকম তর্কের মাধ্যমে পালাকার তার বর্ণিত আখ্যান দর্শক চিত্তে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করে থাকেন। *মহুয়া* পরিবেশনায় বর্ণনাত্মক গদ্যাভিনয় পরিলক্ষিত হয়।

২. বর্ণনাত্মক গীত

বর্ণনাত্মক গীত গবেষক বিশ্লেষিত দ্বিতীয় ধারা। "কাহিনীর যে- সকল অংশে সমস্যার জটিল আবর্তে কোনো চরিত্র পতিত হয় বা বিয়োগ বিচ্ছেদে পতিত হয় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল গায়েন বর্ণনত্মাক গীতাভিনয়ের মাধ্যমে ভাবাবেগ তৈরি করে।" (লিপন, ২০১০, পৃ: ৪৮)। ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালায় মূল গায়েনের সাথে থেডা/ডায়না'র অভিনয়ে বর্ণনাত্মক গীতাভিনয় পরিলক্ষিত হলেও পর্যবেক্ষিত পরিবেশনায় তা দেখা যায় নি।

৩. সংলাপাত্মক অভিনয়

পরিবেশিত মহুয়া পালা সংলাপাত্মক অভিনয় বিদ্যমান। এই অভিনয়ের মূল বৈশিষ্ঠ্ হলো "আখ্যানের গৌণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের সংলাপাত্মক অভিনয়ের জন্য যন্ত্রীদল বা ছুকরিদ্বয় নিজ আসনে বসে থেকেই একটি উক্তি- প্রত্যুক্তির মাধ্যমে পরিবেশন করেন। এ সময়ে মূলগায়েন বা সহ- অভিনেতা মধ্যবর্তী বৃত্তে আবর্তন করে চরিত্রেটি অভিনয় করে।" (লিপন, ২০১০, পৃ: ৪৯)। গবেষণার প্রয়োজনে পর্যবেক্ষিত পরিবেশনায় পূর্বে ধারণকৃত শব্দের (অডিও ট্র্যাক) মাধ্যমে অঙ্গভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ করেছে। 'প্রসেনিয়াম' মঞ্চাভিনয় হওয়ায় মঞ্চে আসরের ন্যায় অভিনেত্রী-অভিনেতারা সার্বক্ষণীক অবস্থান করেন নি।

৪. সংলাপাত্মক গীত

ঐতিহ্যবাহি লোকনাট্যের পালাভিনয়ের অন্যতম বিশেষ অভিনয়শৈলী সংলাপাত্মক গীত। হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে এই শৈলী বেশি লক্ষণীয়। আখ্যানের বিশেষ কোনো অংশ গায়েন গীতের মধ্যমে দর্শকের কাছে বর্ণনা করে থাকে। কতটুকু হবে বা কী হবে তার সম্পূর্ণটাই গায়েনের উপর নির্ভর করে। গায়েন নিজের ও দর্শকের মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী অভিনয়ের তারতম্য ঘটানোর ক্ষমতা রাখেন।

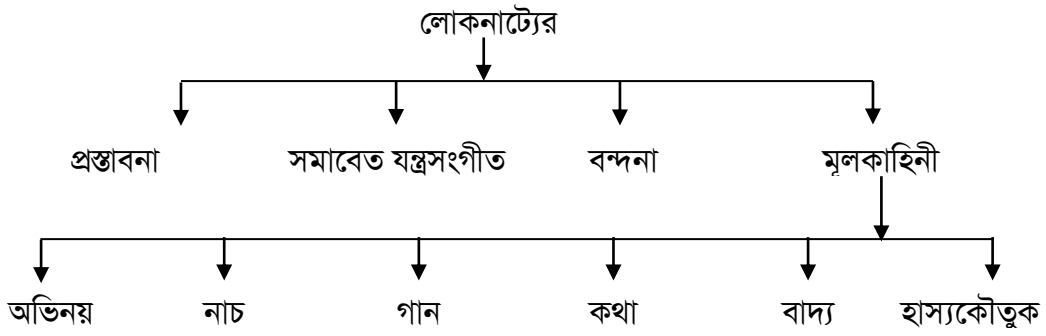

(রিপন, ১৯৯৭)

জাহিদ রিপন তার আলোচনায় লোকনাট্যের অভিনয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কাঠামোকে নির্দেশ করেন। মহুয়া পালায় উক্ত কাঠামো কার্যকর হতে দেখা যায়।

বিশ্লেষিত মহুয়া প্রযোজনার অভিনয়ে ধারণকৃত শব্দ (অডিও ট্র্যাক) নির্ভর উপস্থাপন পরিলক্ষিত হয় যার ফলে লোকনাট্যের দর্শক ও অভিনেতা- অভিনেত্রীর যে মিথস্ক্রিয়া হবার প্রয়োজন রয়েছে তার সম্পূর্ণ ব্যত্যয় ঘটে। পূর্বনির্ধারিত 'অডিও ট্র্যাক' ব্যবহারের ফলে অভিনয়ের তাৎক্ষণিকতা যেমন হারায় তেমনি বাধাগ্রস্থ হয় অভিনেতা ও দর্শকের আন্তঃসম্পর্কের। এই 'অডিও ট্র্যাক' নির্ভরতার পেছনে দলের আর্থিক এবং কলা- কুশলীর সামর্থ্যের অভাব বিদ্যমান। বাংলাদেশের পেশাদারি নাট্যচর্চা না হওয়ায় এমন প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। পর্যবেক্ষিত নাট্যের কার্যকর অর্থ তৈরিতে অযাচিতভাবে যান্ত্রিকতার সাহায্য নেয়া হয়। বোধ করি যান্ত্রিকতার সাথে সমঝোতা নয় বরং এ পালায় যান্ত্রিকতার দাসত্বই মূখ্য বলে বিবেচ্য। ঐতিহ্যবাহি লোকনাট্যের সবচেয়ে বড় শক্তি অভিনেতার অপার স্বাধীনতা। দর্শকের মনস্তত্ত্ব অনুয়ায়ী তাৎক্ষণিক (ইম্প্রোভাইজেশন) করার সক্ষমতা। বিশ্লেষিত তিনটি প্রযোজনায় অভিনেতাকে গৌণ করে তুলেছে। অভিনয় এখানে শৈলী নয় বরং পুনরাবৃত্তিমূলক কৃত্রিম (ম্যাকানিক্যাল) আচরণ বললেও ভুল হবে না। শুধু তাই নয় অভিনয়ের নবতর সংযোজন- বিয়োজন, সংগীতের অভিব্যক্তিরও কোন পরিবর্তন ঘটে না। ফলে নাট্যাখ্যানের ঘটনা প্রবাহে সমকালীন দর্শন উপস্থাপনে অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়। প্রস্তুতকৃত একটি 'অডিও ট্রাক' এর মাধ্যমেই অভিনেতা- অভিনেত্রী তাদের কিছু কৌশল দেখিয়ে গেছেন মাত্র।

গ্রন্থপঞ্জি

Spivak, Gayatri. chakraborty. (2004). *Can The Sublтern speak*. Histoty Workshop journal. 58(58),3-59. Retrievedfrom muse.jhu.edu/journal/history_workshop_journal/summary/v058/58.1barrett.html.

W. J. T. Mitchell. (1994). *Picture Theory (Essays on Verbal and Visual Representation) Retrieved from* https://cutt.ly/Lkw9ClO

আউয়াল, সাজেদুল। (২০১৫)। *বাংলা নাটকে নারী পুরুষ ও সমাজ*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

আজাদ, হুমায়ুন। (২০১৭)। *নারী*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

চৌধুরী, কবির, চৌধুরী, সৈকত। (১৯৯৭)। *তসলিমা নাসরিন ও নারী মুক্তি প্রসঙ্গ*। ঢাকা: প্রত্যাশা প্রকাশন।

নারীর ইতিহাস চর্চা। (২০০২)। *নারীর ইতিহাসচর্চায় পদ্ধতি তত্ত্বের অন্বেষণ। প্রেক্ষিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*। গবেষণাপত্র, নৃ- বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার।

পারুল, জোহরা। (২০১৩)। *নারীর ইতিহাস*। ঢাকা: সংবেদ প্রকাশনা।

ময়মনসিংহ গীতিকা। (২০১৯)। *মহুয়া*। মাহবুবুল আলম (সম্পা)। ঢাকা: বাংলাবাজার। পৃ: ৪১- ৬৬

মুহাম্মদ, আনু। (২০০৫)। *নারী পুরুষ ও সমাজ*। ঢাকা: সন্দেশ।

রবীন, সারোয়ার কামাল। (২০২১, অক্টোবর ৩০)। গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, (১৯৩২ নভেম্বর ২৪)। *মৈমনসিংহ গীতিকা (মহুয়া ও দেওয়ানা মদিনা ২০১১)*, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর সঙ্কলিত। সুচয়নী পাবলিশার্স, পৃ: ৪৪- ৮৬

সরকার, চিররঞ্জন। (২০১০)। *নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন চ্যালেঞ্জ ও করণীয়*। ঢাকা: বাংলা প্রকাশ।

সালেকীন, সিরাজ। (২০১০)। *ভারতীয় সমাজে নারীকথা*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

হক, সৈয়দ আজিজুল। (২০১৩) *ময়মনসিংহ গীতিকা, জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য*। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা

রিপন, জাহিদ।(জুন ১৯৯৭,) লোকনাট্যের আধুনিক উপস্থাপনরীতি 'মৈয়মনসিংহ গীতিকা'র 'কাজলরেখা', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৬।

লিপন, সাইদুর রহমান। (২০১০) *বাংলাদেশর লোকনাট্যে অভিনয় পদ্ধতি* । ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

মহুয়া পালা পরিবেশনার ক্ষেত্রে শহরায়তনে পালা উপস্থাপনের চিরায়ত রূপের পরিবর্তন সাধন হতে দেখা যায়। সময়ের পরিবর্তনে জীবন যাপনের এই পরিবর্তন মূলত মানব জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। তবে পরিবর্তন কাঙ্ক্ষিত হতে হবে। পালার যথার্থ অর্থ তৈরির বিপরীতে শুধুমাত্র দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনা কাম্য নয়।

উক্ত বিশ্লেষণে অতীতের নারী এবং বর্তমান নারী সম্বন্ধে বিশেষ ধারণালাভ করা যায়। বর্তমানের নারী দৃশ্যত অনেক বেশি স্বাধীন, কর্মক্ষম, ভাবপ্রকাশে পটু বলে মনে হলেও আদতে তা অন্তঃসারশূন্য। এখনো সমাজকাঠামোয় নারী সর্বক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ।

> রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী যে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না তার জন্য সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাই দায়ী। একদিকে জাতীয় সংসদ বা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নারীর 'সংরক্ষিত' প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে অন্যদিকে পারিবারিক শৃংখলে বন্দি করা হয়েছে। বলা হচ্ছে নারীকে ভালো স্ত্রী ও ভালো মা হতে হবে। সংসারের ভালো-মন্দ দেখতে হবে যার কোনো বিনিময় মূল্য নেই। পরিবারের এই বৃত্ত ভেঙে ক'জন নারীর পক্ষে বাইরের জগতে কাজ করা সম্ভব? বিষয়টি অনেকটা কারো পায়ে শিকল দিয়ে উড়তে বলার মতন। (কামাল, ২০১০, পৃ: ২০)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নারীকে যোগ্য হয়ে ওঠার নিমিত্তে কঠোর প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দিয়েছে। নারীকে সীতার ন্যায় পরীক্ষা দিতে হয় প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যদিও এই পরীক্ষার ফলাফল থাকে পূর্বনির্ধারিত।

> ১৯৭৫ সালের মেক্সিকো সম্মেলনে এসথার বোসেরাপের 'Women's Role in Economic Development' নামের গবেষণা গ্রন্থটি বিশ্ব বিবেকে একটা ধাক্কা দিয়েছিল এ কারণে যে, গ্রন্থটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকার এমন এক চিত্র তুলে ধরেছিল, যা কখোনই নীতিনির্ধারকদের কাছে ধরা পড়েনি। গবেষক লেখিকা পরিষ্কার ভাষা-বাক্য, তত্ত্ব-উপাত্ত উপস্থাপন করে দেখিয়ে দিয়েছেন, নারী কর্ম করেই জীবন ধারণ করে, পরের উপরে ভর করে নয়। কিন্তু এ ধরণের কর্মকে 'কর্ম' বলে স্বীকার না করার কারণে এ ধরণের কর্মে নিয়োজিত নারীকে কর্মজীবী বলেও স্বীকার করা হয় না। (কামাল, ২০১০, পৃ: ১২২)

প্রাত্যহিক সকল কর্মকাণ্ড নারীর কর্তব্য বলেই বিবেচিত। সমাজ নারীর এই দৈনন্দিন কর্মকে বাধ্যানুগত থাকার মৌলিক শর্ত বলেই মনে করে।

পরিবারের প্রাত্যহিক কার্যক্রমে নিয়োজিত নারী বিশেষ সম্মান লাভ করে না, এমনকি কর্মজীবী নারীর প্রতি সমাজে বৈরি মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। গৃহকর্মে নিয়োজিত নারীকে 'অবলা' নারীর তকমা প্রদান করার হলেও সমাজের অধিকাংশ কর্মজীবী নারীও নিজের সিদ্ধান্ত প্রকাশে প্রায়শই নীরব থেকে যায়। মহুয়ার ক্ষেত্রেও এই ধারণা প্রকাশ পেয়েছে।

নারীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে এমনটা ভাবাটাও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির নামান্তর। নারীমুক্তির সাথে একাত্ব হতে অনেক পুরুষকেও এগিয়ে আসতে দেখা যায়। মূলত নারী-পুরুষ ধারণার বাইরে মানবতাকে সামনে নিয়ে আসলে এই সংকট অনেকটাই প্রশমিত হতে পারে। দৈনন্দিন জীবনেও অনেক পুরুষ নারীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজে এগিয়ে চলেছে, ঠিক তেমনি শিল্পেও অনেক পুরুষ নারীর বয়ান উপস্থাপনে পিছপা হয় না।

মহুয়া নাট্য পালাটি পুরুষ নাট্যকার রচিত। পুরুষ নির্দেশকের নির্দেশনায় মঞ্চায়িত হয়ে আসছে। এছাড়াও এই নাট্যদলসমূহ পুরুষ আধিপত্যে পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং এটি অবশ্যই বোধগম্য যে, এমতাবস্থায় নারীর প্রতিরূপায়ণ কীভাবে কার্যকর হচ্ছে। আবার, এ কথাও গুরুত্বপূর্ণ, সকল পুরুষই কি নারীর জন্য কিংবা নারী সম্বন্ধে নেতিবাচক অবস্থার সৃষ্টির জন্য দায়ী! না কি নারী নিজেও কখনো কখনো এর জন্য দায়ী?

জুরিথ বাটলার বলেন,

> জেন্ডারপূর্ব নির্ধারিত নয়। জেন্ডার এমন এক নমনীয় পরিচয় যা ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তিতে পরিচালিত হয়। অভিকরণশীলতা হল ভাষাগত এবং আবাচনিক সফল প্রকাশক্ষম ক্রিয়ার প্রকাশ যা পরিচয় ও স্বরূপতা নির্মাণ করে। অভিকরণশীলতা পরিচয় নির্মাণ করে একই সাথে ঐ পরিচয়ের আশে-পাশে ঘিরে থাকা বাস্তবতাকে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করে। জৈবিকভাবে নির্মিত নারী-পুরুষের ধারণা হলো পুনঃধারণা, যৌনতার ধারণাটা সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত? (Butler, 2011)

সুতরাং জৈবিকতা কিংবা যৌনতার ধারণা নারী-পুরুষ চিন্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরির প্রধান শর্ত নয়। পুরুষ নাট্যকার, নির্দেশক কিংবা দলপ্রধান হলেই তার প্রভাব নারীর অবস্থা প্রকাশে নেতিবাচকতা প্রকাশ করবে তা নাও হতে পারে। আবার

নেতিবাচকতার প্রভাবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করাও যায় না। এই পালাটির উপস্থাপনায় তাই প্রতিরূপায়ণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

নাট্যে যেখানে অভিনেতা পক্ষে দাঁড়ায় (Stand for) বা ছদ্মবেশ ধারণ করে গল্পের চরিত্রের হয়ে আর সেই 'পক্ষে দাঁড়ানো' কোন 'পক্ষে কথা বলে' (Act for) তার ব্যাখ্যা *মহুয়া* সম্বন্ধে নবধারণা লাভে সহায়তা করেছে। উদ্দেশ্যে এক হলেও প্রকাশভঙ্গীর কারণে নির্মিত অর্থ ভিন্ন হতে পারে। নারীর নামকরণে পরিবেশিত প্রযোজনা নারীর অসহায়ত্যের বহিঃপ্রকাশ হয়ে উঠতে পারে। একবিংশ শতাব্দীর আপাত আধুনিক নারী এখনো মহুয়ার মতো খুঁজে পেতে চাইতে পারে তার স্বাধীনতা। অর্থাৎ দৃশ্যত সমাজের পরিবর্তন কতটা অন্তঃসারশূন্য তা উপলব্ধি করে এই গবেষণা সমাজকে নারী মুক্তির কুহক জাল সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পারে। তবে একথাও স্বীকার্য এই সংকট শুধু নারীর জন্যেই প্রযোজ্য তা নয়, কিছু ক্ষেত্রে পুরুষও এ সকল সংকট এড়াতে অক্ষম। সুতরাং নারী কিংবা পুরুষের দৃষ্টিতে নয় মানুষ হিসেবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজে এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। বর্তমানে অনেক নারীবাদী আন্দোলনকর্মী নিজেদের নারী আন্দোলনের সাথে নয় মানবতাবাদী আন্দোলনের কথা বলছে।তবে একথাও স্বীকার্য এই সংকট শুধু নারীর জন্যেই প্রযোজ্য তা নয়, কিছু ক্ষেত্রে পুরুষও এ সকল সংকট এড়াতে অক্ষম। সুতরাং নারী কিংবা পুরুষের দৃষ্টিতে নয় মানুষ হিসেবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজে এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। বর্তমানে অনেক নারীবাদী আন্দোলনকর্মী নিজেদের নারী আন্দোলনের সাথে নয় মানবতাবাদী আন্দোলনের কথা বলছে।

গ্রন্থপঞ্জি

Butler, Judith; Weed, Elizabeth (2011). The Question of Gender: Joan W. Scott's Critical Feminism. Bloomington, IN: Indiana University Press. ISBN 978-0-253-00153-5.
Millet, Kate. (1970). Sexual Politics. U.S.A: Doubleday and Co
Spivak, Gayatri. chakraborty. (2004). *Can The Subltern speak.* Histoty Workshop journal. 58(58),3-59. Retrievedfrom muse.jhu.edu/journal/history_workshop_journal/summary/v058/58.1barrett.html.
W. J. T. Mitchell. (1994). *Picture Theory (Essays on Verbal and Visual Representation) Retrieved from* https://cutt.ly/Lkw9ClO
আউয়াল, সাজেদুল। (২০১৫)। *বাংলা নাটকে নারী পুরুষ ও সমাজ*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।
আজাদ, হুমায়ুন। (২০১৭)। *নারী*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
কামাল, সুলতানা। (২০১০ ক)। *নারী, মানবাধিকার ও রাজনীতি*। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।
চৌধুরী, কবির, চৌধুরী, সৈকত। (১৯৯৭)। *তসলিমা নাসরিন ও নারী মুক্তি প্রসঙ্গ*। ঢাকা: প্রত্যাশা প্রকাশন।
নারীর ইতিহাস চর্চা। (২০০২)। *নারীর ইতিহাসচর্চায় পদ্ধতি তত্ত্বের অন্বেষণ। প্রেক্ষিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*। গবেষণাপত্র, নৃ- বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার।
পারুল, জোহরা। (২০১৩)। *নারীর ইতিহাস*। ঢাকা: সংবেদ প্রকাশনা।
ময়মনসিংহ গীতিকা। (২০১৯)। *মহুয়া*। মাহবুবুল আলম (সম্পা)। ঢাকা: বাংলাবাজার। পৃ: ৪১- ৬৬
মুহাম্মদ, আনু। (২০০৫)। *নারী পুরুষ ও সমাজ*। ঢাকা: সন্দেশ।
রবীন, সারোয়ার কামাল।(২০২১, অক্টোবর ৩০) । গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার।
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, (১৯৩২ নভেম্বর ২৪)। *মৈমনসিংহ গীতিকা (মহুয়া ও দেওয়ানা মদিনা ২০১১),* শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর সঙ্কলিত। সুচয়নী পাবলিশার্স, পৃ: ৪৪- ৮৬
সরকার, চিররঞ্জন। (২০১০)। *নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন চ্যালেঞ্জ ও করণীয়*। ঢাকা: বাংলা প্রকাশ।
সালেকীন, সিরাজ। (২০১০)। *ভারতীয় সমাজে নারীকথা*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।
হক, সৈয়দ আজিজুল। (২০১৩) *ময়মনসিংহ গীতিকা, জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য*। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা
রিপন, জাহিদ।(জুন ১৯৯৭,) লোকনাট্যের আধুনিক উপস্থাপনরীতি 'মৈয়মনসিংহ গীতিকা'র 'কাজলরেখা', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৬।
লিপন, সাইদুর রহমান। (২০১০) *বাংলাদেশর লোকনাট্যের অভিনয় পদ্ধতি* । ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

সংযুক্তি

"মহুয়া পালা" সম্পর্কে প্রশ্নাবলী

১. আপনার দল কতদিন ধরে পরিবেশনার সাথে যুক্ত?
২. কতগুলো নাটক মঞ্চায়ন করেছেন?
৩. কতজন নারী এবং কত জন পুরুষ- আপনার দলের সদস্য।
৪. নারী পুরুষ বৈষম্যের কারণ কী?
৫. মহুয়া পালার কত দিন ধরে পরিবেশনা করছেন? কতবার মঞ্চায়ণ করেছেন?
৬. মহুয়া পালার নির্বাচনের কারণ কী?
৭. মহুয়া পালার পরিকল্পক কে?
৮. মহুয়া পালার নির্দেশক কে?
৯. নির্দেশক, অভিনেতা, ও পরিকল্পকের দৃষ্টিতে মহুয়া চরিত্রটি কেমন?
১০. মহুয়া চরিত্র নির্মাণে আপনার প্রতিবন্ধকতা?
১১. পুরুষ নির্দেশন বা সহঅভিনেতাদের সাথে কাজ করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা হয় কি?
১২. বর্তমানের নারী চিন্তা ও পালার মহুয়া চরিত্রের মধ্য পার্থক্য কোথায়?
১৩. বর্তমানের নারী চিন্তা ও পালার মহুয়া চরিত্রের সামজস্যতা কোথায়?
১৪. মহুয়ার ভিতরে নারী অধিকার/ ক্ষমতায়ণ কিভাবে দেখেন?
১৫. আপনারা যাপিত জীবনের নারী অধিকার/ ক্ষমতায়ণ সম্বনিত রাখা কি সম্ভব? হ্যা- না- কারণ?
১৬. মহুয়ার আত্মহুতি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে কিভাবে ব্যাখ্যা করেন?
১৭. পালং সই একজন নারী হিসেবে মহুয়ার অসহায়ত্বে কী কী কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে? মহুয়াকে সে আর কিভাবে সাহায্য করতে পারত?
১৮. বর্তমান সময়ে এই নাটকের উপস্থাপনায় কোনো পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন কি? কেন?

করোনাকালীন থিয়েটার চর্চা সম্পর্কে প্রশ্নাবলী:

১. মানসিক বা শারিরিকভাবে করোনাকালীন সময়ে থিয়েটার চর্চায় কতটা যুক্ত ছিলেন?
২. থিয়েটার পরিবেশনা হয়েছে কিনা? প্রক্রিয়া কেমন ছিল?
৩. আপনাদের করোনার আগে কতজন সদস্য ছিল? এখন কতজন আছে?
৪. নতুন কোন সদস্য সংযোজন হয়েছে কিনা?
৫. থিয়েটারর মাধ্যমে আপনার কোনো আয় ছিলো কি? বিকল্প কোন আয় ছিল কি না?
৭. আপনার দল পরিচালনায় কেমন অর্থ প্রয়োজন পড়ে?
৮. একটি নাটক পরিবেশনার জন্য কেমন খরচ হয়?
৯. খরচ কিভাবে যোগাড় হয়?
১০. শিল্পরা কোনো ভাতা পান কিনা?
১১. মাসিক, বাৎসরিক, প্রযোজনাভিত্তিক সরকারী ও বেসরকারী পৃষ্টপোষকতা কেমন পান?
১২. থিয়েটার শিল্পের উন্নয়নে রাষ্ট্রের করণীয় কি?।
১৩. নাট্য দল পরিচালনায় কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়?

১৪. করোনা পরবর্তীতে কোনো নাটক প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চায়ন হয়েছে কিনা।
১৫. নাটকে দর্শকের উপস্থিতি কেমন ছিল?
১৬. দর্শনির মূল্য ছিল কি? দর্শনির বিনিময়ে আয় কতো ছিল?
১৭. করোনার মত এমন সংকট দেখা দিলে তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য কি ধরণেরর প্রস্তুতি নিয়েছেন?
১৮. কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলায় থিয়েটারের ভূমিকা কি ছিল?
১৯. বর্তমান পরিস্থিতিতে থিয়েটার শিল্পের জন্য সরকারের কি করণীয় ছিল?
২০. কোভিড পরিস্থিতিতে থিয়েটারের তুলনায় অন্যান্য মাধ্যম বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কী? আপনাদের দলে এর কোন প্রভাব পড়েছে কিনা?
২১. বর্তমান পরিস্থিতির কারণে আমাদের দর্শক সংকট দেখা দিলে প্রেক্ষাগৃহের বাইরে নাটককে পরিবেশনার কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কী?
২২. প্রেক্ষাগৃহের বাইরে কোন নাটক করেছেন কিনা?
২৩ থিয়েটার নিয়ে ভবিষৎ ভাবনা কী।